গৌড়ীয় গীতা।

গীতামূল ও ভাষ্য।

শংেক চরণ ভুলি ওরে ভোলা মতি।
নৃত্য কর কোন মদে মত্ত হয়ে অতি ॥
ত্যজ দম্ভ অহঙ্কার দুরন্ত দুর্মতি।
গোপন গোধান তব সজ্ঞান সঙ্গীত ॥
পাগল হইয়ে কেন ভম পান্থ মতি।
লভিতে যে গন্ধ ধন শুখাল সুবতি ॥
স্বাধীন হইয়ে ধন অধীন পকৃতি।
মীনসম বদ্ধ জালে কোথা রে পিরীতি ॥
বিযাক্ত বিষযমধু পানে হল মাত।
রসময় রস পানে নাহি হল রাত।
[illegible] চিন্তামণি নাহি মন পাতি।
[illegible] অন্তর সিন্ধু [illegible] প্রকৃতি ॥

কলিকাতা।

শ্রীমতী মহিষগ্নী কৃষ্ণপদদাসী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৭৮ নং গড়পার রোড।

১৫ই কার্ত্তিক, সম্বৎ ১৯৪৮।

শ্রীশ্রীহরিঃ।
শরণং।

প্রকাশিকার বিজ্ঞাপন।

বেদরূপ দুগ্ধসাগর হইতে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত রূপ দধি প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই দধি মন্থন করিয়া যে অমূল্য নবনীত উত্থিত হইয়াছে—তাহাই এই ভগবদ্গীতা নামক পঞ্চমবেদীয় উপনিষৎ।

বেদ জগদ্ব্যাপ্ত এবং জগৎও বেদব্যাপ্ত। কারণ জ্ঞান ও কর্ম্ম লইয়াই জগৎ এবং বেদই সেই জ্ঞান ও কর্ম্ম কাণ্ডের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি। বেদ—শ্রুতি ও বেদ—এই দুই নামে খ্যাত। শ্রুতি বলিতে শ্রবণ, সুতরাং শব্দ বুঝায়, শূন্যের গুণ শব্দ এবং শূন্য হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী এবং পৃথিবী হইতে যাবতীয় চেতনাচেতনাদি পদার্থের উৎপত্তি প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ হইতেছে। পুনরায় ঐ পার্থিব পদার্থ সকল পৃথিবীতে, পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে এবং বায়ু শূন্যে এইরূপে অনবরত সমস্ত লয় হইতেছে। অতএব একমাত্র শূন্যেই এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় রূপ সত্ত্বা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু শূন্যের সত্ত্বা বা বিদ্যমানতা সঙ্কোচবিস্তাররূপ শক্তিতে অবস্থান করিতেছে, কারণ যেখানে কিছুই নাই শুদ্ধ অবকাশ মাত্র তাহাকেই শূন্য কহে এবং শূন্যই পরম্পরারূপে জগৎকে জলবুদ্বুদের ন্যায় উদ্ভব করিতেছে—ধারণ করিয়া রহিয়াছে—আবার আপনাতেই মিশাইয়া লইতেছে, এবং সেই শক্তির সত্ত্বাও কেবল মাত্র জ্ঞানে উপলব্ধি হয় অর্থাৎ শক্তির জ্ঞান বা অনুভব হয়, কারণ কেহ কখন আমি শক্তি এরূপ কহে না, আমার শক্তি এইরূপই কহে, সুতরাং আমাতে বা আমজ্ঞানে শক্তির অনুভব হয়। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, কারণ আমার জ্ঞান নাই অর্থাৎ আমাতে আর আমি নাই, এরূপ কেহ কহে না বা অনুমানও করে না। অতএব এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু জ্ঞান নিয়তই শক্তিযুক্ত এবং শক্তি হইতেই জগৎ। সুতরাং জ্ঞান ও শক্তি বা পুরুষ ও প্রকৃতি বা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বা পুণ্য ও পাপ বা সৎ ও অসৎ এই দুই লইয়াই জগৎ। তন্মধ্যে জ্ঞানের ব্যাপার অদৃশ্য এবং কেবলমাত্র

অনুমেয় এবং শক্তির কাণ্ড দৃশ্য মনোহর নামরূপাদিযুক্ত। পরম হিতৈষী বেদ এইরূপে অন্তর্জ্জগৎকে জ্ঞানকাণ্ড নামে কীর্ত্তন করিয়াছে এবং সর্ব্বশক্তিমান শ্রুতি বাহ্য জগৎকে কর্ম্মকাণ্ড নামে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বাহ্যজগৎ অবিশ্রান্ত সংযোগবিয়োগরূপ কর্ম্মচক্রে ঘূর্ণায়মান বলিয়াই ইহার নাম কর্ম্মকাণ্ড হইয়াছে।

সেই জগতের বাহ্য ও অন্তর্ভেদী বেদের সার ভারত এবং সেই সারের সার ভারতের সার এই ভগবদ্গীতা। যেরূপ মানচিত্রে দৃষ্ট নদ নদী পর্ব্বতাদি ভৌতিক পদার্থসকল অঙ্কিত হইলেও প্রাকৃত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জ্ঞান দিবার জন্য গীতারূপ যোগশাস্ত্র চিত্রপটে সেই অদৃশ্য অনুমেয় জ্ঞানকাণ্ডের পূর্ণ চিত্র চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। অতএব যদি কেহ এই স্বপ্নবৎ দেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের পূর্ণ অবয়ব, বিজ্ঞানের গুহ্যতম রহস্য এবং আত্মতত্ত্বের জলন্ত জ্যোতি দেখিতে ইচ্ছা করেন—তবে একবার প্রাণ ভরিয়া গীতারস পান করুন। তিনি শাক্তই হউন, বা শৈবই হউন, যোগীই হউন বা ঋষিই হউন, জ্ঞানীই হউন বা অজ্ঞানীই হউন, হিন্দুই হউন বা মুসলমানই হউন অথবা আস্তিকই হউন বা নাস্তিকই হউন, তাঁহার জীবনের জীবন্ত আশা সফল হইবে, চিরসন্তপ্ত হৃদয় চিরপরিতৃপ্ত হইবে, অন্তর অন্তরে অন্তরে আনন্দসাগরে সন্তরণ করিবে এবং দুর্লভ মানবজীবন সফল হইবে।

এক্ষণে কালের যেরূপ গতি তাহাতে জ্ঞানরূপ অমূল্যনিধি এই মূল্যপ্রিয় সমাজে যত্ন করিয়া আহরণ করে এমন লোক অতি বিরল। কালের যদি এই গতি, তবে দুরূহ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভগবদ্গীতা পড়ে এমন লোকই বা কত পাওয়া যায়। অতএব চলিত গৌড়ীয় শ্লোকে ভাষান্তরিত হইলে, বঙ্গবাসিগণ গুন্ গুন্ গানেও গীতাগানে বৃথাকাল অজ্ঞাতসারে সার্থক করিতে পারিবে—এই অভিপ্রায়ে বাবাজি উক্ত ভগবদ্গীতা অবিকল শ্লোকে শ্লোকে গৌড়ীয় কাব্য রচনা পূর্ব্বক ভাষ্যসহ আমার করে উৎসর্গ করায়, আমি ভক্তগণের নিকট ভক্তিসহকারে এই ভক্তির ধন প্রকাশ করিলাম।

আমার মূল্য লইবার একান্ত ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি করি তাদৃশ সঙ্গতি নাই, তাহাতে আবার ভক্তের জননী ভগবান্ ভক্তকে চিরকালই কঠোর পরীক্ষা করিয়া থাকেন এবং দারিদ্রসাগরে নিক্ষেপ করিয়া পরম ধামের জন্য প্রস্তুত করিতে থাকেন।

কলিকাতা, ৭৮ নং গড়পার রোড। ১৫ই কার্ত্তিক, সন ১২৯৮ সাল।

বিনীতা
শ্রীমতী মহিমময়ী কৃষ্ণপদদাসী।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

উৎসর্গ।

প্রণমি পরমহংস শিবদাস পদে।
যে পদে অভয় নিতে ছুটি পদে পদে ॥

লয়েছি শরণ এবে পরম চরণে।
পরম আনন্দময় ব্রহ্মপদ জ্ঞানে ॥

তুচ্ছ হয় দৈবপদ যে পদের ধ্যানে।
বিপদ সম্পদ হয় যে পদ স্মরণে ॥

পুনশ্চ প্রণাম করি আনন্দ হিল্লোলে।
কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন চরণ কমলে ॥

যে পদের জ্যোতি সারা দিন রাতি
উজলিছে মূঢ় মোর মতি নিরাকার।
যে পদ আঘাত হয়ে প্রতিঘাত
শৈশবে খুলেছে গুপ্ত জ্ঞানের দুয়ার ॥

নমি পুন মহিষঘ্নী জননীচরণে।
সদ্যমুক্তি আদ্যাশক্তি অভেদভাবনে ॥

যে পদ ছায়ায় শান্তি সতত বিরাজে।
আমার আমিত্ব রয় যে পদপঙ্কজে ॥

জগত প্রকাশে যাঁর নখের কণায়।
আমি ত কীটাণু কীট সে পদধুলায় ॥

মহাজন পদ যত লইয়ে শরণ।
শক্তিকরে শক্তকর্ম্ম করিনু অর্পণ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গৌড়ীয় গীতা।

মঙ্গলাচরণ।

জয় জয় জ্যোতির্ম্ময় ব্যাপ্ত সর্ব্ব বিশ্বময়
পরম আনন্দময় পুরুষ প্রধান।
অনাদি অখিলভূপ নিরগুণ নিররূপ
নিরঞ্জন জ্ঞানকূপ নির-অবসান॥

নিরবেশ নিরনাম নিরভূষা নিরধাম
স্বপ্রকাশ অবিরাম বিদিত বিজ্ঞান।
নির-অংশ নিরবংশ নিরহ্রাস নিরধ্বংস
প্রেমিক পরমহংস পরম নিদান॥

আবেশে ত্রিগুণ ধর পরমেশ পরাৎপর
মহাবীর মহেশ্বর চতুর-আনন।
দশভুজা তুমি উমা অন্নপূর্ণা পূর্ণকামা
আদ্যাশক্তিরূপা শ্যামা আঁধারবরণ॥

তুমি সীতা তুমি রাম তুমি রাধা তুমি শ্যাম
তুমি হরে কৃষ্ণ নাম অধমতারণ।
তুমি ভক্তি ভক্তিময় শাক্ত শৈব সৌরচয়
দেব দেবী তীর্থময় ভাবুক ভাবন॥

অগ্ন্যাদি আকাশ বায়ু তুমি পঞ্চভূত-আয়ু
পরমাণু পরমায়ু পরম-সৃজন।
তুমি লতা তুমি বৃক্ষ তুমি পক্ষী তুমি পক্ষ
তুমি রক্ষ তুমি ভক্ষ তোমারি গঠন॥

তুমি রম্য উপত্যকা বালুময় মরীচিকা
তুমি ঘোর বিভীষিকা সুদিন কুদিন।
তুমি বার সম্বৎসর যুগ মনু মন্বন্তর
জাগরূক নিরন্তর নিমেষবিহীন॥

তুমি সূর্য্য তুমি চন্দ্র তুমি স্বর্গ তুমি ইন্দ্র
তুমি হে নগেন্দ্র কেন্দ্র নবীন প্রবীণ।
তুমি ধান্য তুমি ধন তুমি পণ্য তুমি পণ,
নদ নদী উপবন নগর বিপিন॥

পুরুষ প্রকৃতি তুমি বীজ বিন্দু রজ ভূমি
রোপক রোপণ তুমি কামনা মিলন।
জীবন যৌবন তুমি স্বপ্নপ্রাপ্ত রাজ্য ভূমি
তোমাতে উৎপন্ন তুমি চেতনাচেতন॥

তুমি মোহ তুমি মায়া তুমি কায় তুমি কায়া
জনক জননী জায়া আত্মীয় স্বজন।
তুমি রাজ্য তুমি রাজা তুমি পূজ্য তুমি পূজা
তুমি দীন হীন প্রজা দলিত দলন॥

তুমি ভাব তুমি ভাবী ভূত বর্ত্তমান ভাবি
সদাই ভাবনা ভাবি ভাবেতে মগন।
তুমি দুখী তুমি দুখ তুমি সুখী তুমি সুখ
তুমি হীনসুখদুখ পিরীতি-সদন॥

তুমি হে খনিজ খনি প্রবাল মুকুতা মণি
কালকূট কালফনি দংশিত দংশন।
তুমি পয় পয়োধর জলধারা জলধর
তুমি মধু মধুকর কমলকানন॥

তুমি তৃষ্ণা তুমি জল তুমি আশা তুমি ফল
তুমি হে দুর্ব্বল বল ধৈরয ধারণ।
তুমি তপ্ত তুমি তাপ অভিশপ্ত অভিশাপ
পুণ্য পাপ পরিতাপ পরমবন্ধন॥

তুমি শান্তি তুমি শান্ত অতীব দূর দুরন্ত
বিরাজিত জীব-অন্ত জীবন্ত প্রমাণ।
তুমি পাশী তুমি পাশ পাশবদ্ধ মুক্তপাশ
জরা ব্যাধি শ্বাস কাস শয়ন শয়ান॥

তুমি ভ্রান্তি তুমি ভ্রান্ত তুমি পথ তুমি পান্থ
বেদাঙ্গ বেদ বেদান্ত জ্বলন্ত জ্বালন।
তুমি জ্ঞান তুমি জ্ঞাতা তুমি ত্রাণ তুমি ত্রাতা
তুমি বিধি বিধিদাতা করণ কারণ॥

তুমি তন্ত্র তুমি তন্ত্রী তুমি মন্ত্র তুমি মন্ত্রী
তুমি ভবযন্ত্রযন্ত্রী ভজন পূজন।
তুমি যোগ যোগাসন তুমি হে যোগীন্দ্রগণ
তুমি কর তোমা ধ্যান তোমারি কারণ॥

তুমি হে সবার সব চৌদিকে উঠিছে রব
স্থাবর জঙ্গম সব করিতেছে গান।
নিখিল ভুবন চয় তোমার ইচ্ছায় রয়
তোমাতেই হয় লয় তুমি বিদ্যমান॥

একমাত্র তুমি সত্য অনিত্য জগতে নিত্য
তোমাভিন্ন বস্তু সত্য নাহি কিছু আন।
ভেদ যত দেখে আঁখি সকলি মায়ার ফাঁকি
ঢেকে যেন জ্ঞান আঁখি ছলে মন প্রাণ॥

"আসে আসে" আশাপাশে বসিয়ে যাহার আশে
অতীত যেমনি আসে নহে বর্ত্তমান।
যেরূপ নেহারি ধরি ধরে অন্য রূপ হেরি
ক্ষণে নব রূপধারী তুমি হে অজ্ঞান॥

হেন রূপে মুগ্ধ মন অবিশ্বাসী মূঢ় জন
নাহি পায় অন্বেষণ ভ্রমিয়া ভুবন।
তুমি হে অতীতসৃষ্টি নয়ন না পায় দৃষ্টি
আঁখি মুদে করে দৃষ্টি যোগে যোগিগণ॥

যে নরে তোমারে স্মরে নিরন্তর ধ্যান করে
অপার আনন্দনীরে সেই ভাসমান।
কি ছার কামনা তার তোমা জ্ঞান হয় যার
কত দূর বল তার মুকুতি নির্ব্বাণ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গৌড়ীয় গীতা।

প্রথম অধ্যায়।

মোহ যোগ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন।
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে মিলি যুদ্ধাশয়।
পুত্রগণ, পাণ্ডবেরা, কি করে সঞ্জয়॥ ১॥
সঞ্জয় কহিলেন।
ব্যূহিত পাণ্ডব সেনা হেরি দুর্য্যোধন।
আচার্য্যসমীপে রাজা কহেন বচন॥ ২॥
মহা-পাণ্ডু-সেনাচার্য্য! হের ব্যূহে স্থিত।
আপন-ধীমান্-শিষ্য-দ্রৌপদ-রচিত॥ ৩॥
মহেষ্বাস শূর ইথে ভীমার্জ্জুন মত।
যুযুধান, বিরাট, দ্রুপদ মহারথ॥ ৪॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—হে সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমি স্বরূপ কুরুক্ষেত্র নামক রণস্থলে আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডবেরা যুদ্ধের ইচ্ছায় মিলিত হইয়া কি করিতেছে? ১॥ সঞ্জয় কহিলেন—পাণ্ডব সৈন্যগণ ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক তন্মধ্যে রহিয়াছে দেখিয়া, রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট গিয়া কহিলেন॥ ২॥ হে আচার্য্য! ঐ দেখুন, আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যূহ রচনা করিয়াছে এবং প্রবল পাণ্ডব সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছে॥ ৩॥ এই রণস্থলে ভীমার্জ্জুনের ন্যায় মহা ধনুর্দ্ধর শূরগণ রহিয়াছে যথা—যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ॥ ৪॥

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ বীর।
পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য নর-শির ॥ ৫ ॥

পরাক্রান্ত যুধামন্যু, উত্তমৌজা বীর।
সৌভদ্র, দ্রৌপদেয়রা, সব রথি-শির ॥ ৬ ॥

মোদের বিশিষ্ট যত বুঝ দ্বিজবর।
সৈন্যের নায়ক কহি আপন গোচর ॥ ৭ ॥

আপনি ও ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ মহারথ।
অশ্বত্থামা, সৌমদত্তি, বিকর্ণ, জয়দ্রথ ॥ ৮ ॥

মদর্থে মরিতে চাহে শূর আর কত।
নানা অস্ত্র-সিদ্ধ সব যুদ্ধ-বিশারদ ॥ ৯ ॥

অপর্য্যাপ্ত এ মোদের ভীষ্ম-রক্ষ বল।
পর্য্যাপ্ত তাদের সেই ভীম-রক্ষ দল ॥ ১০ ॥

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য ॥ ৫ ॥ পরাক্রমশালী যুধামন্যু, বীর উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—ইহারা সকলেই রথিশ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥ হে দ্বিজবর! আমাদের যত প্রধান প্রধান সেনানায়ক আছে, আপনি তা সমস্ত বুঝুন এবং আমিও আপনাকে জানাইবার জন্য কহিতেছি ॥ ৭ ॥ যথা—আপনি ও ভীষ্ম, কর্ণ, মহারথ কৃপ, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ ॥ ৮ ॥ এবং অন্যান্য আরও কত শূরগণ আমার জন্য যুদ্ধে মরিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে—ইহারা সকলেই নানা প্রকার অস্ত্র চালনে পরিপক্ক এবং যুদ্ধনিপুণ ॥ ৯ ॥ তথাপি আমাদের এ ভীষ্মকর্ত্তৃক রক্ষিত সৈন্যগণ অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে অসমর্থ বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু পাণ্ডবদিগের সেই ভীমকর্ত্তৃক রক্ষিত সৈন্যগণ পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে সক্ষম বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১০ ॥

সর্ব্বত্র, ব্যূহের দ্বারে যথা ভাগে স্থিত।
থাকি, রক্ষ ভীষ্মদেবে তোমরা নিশ্চিত॥ ১১ ॥

কুরু-বৃদ্ধ পিতামহ হর্ষিতে কৌরবে।
শঙ্খ নাদ করে বীর উচ্চ সিংহ-রবে॥ ১২ ॥

গোমুখ, পণবানক, শঙ্খ, ভেরী তবে।
সহসা বাদনে শব্দ তুমুল উদ্ভবে ॥ ১৩ ॥

শ্বেত-অশ্ব-যুক্ত মহা রথে থাকি পরে।
মাধব, পাণ্ডব, দিব্য শঙ্খধ্বনি করে ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য, পার্থ দেবদত্ত পুরে।
পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ ভীম বৃকোদরে ॥ ১৫ ॥

অনন্তবিজয় পুরে রাজা যুধিষ্ঠির।
সুঘোষ নকুল, মণিপুষ্প ভাই বীর ॥ ১৬ ॥

অতএব ব্যূহের দ্বারে ও সর্ব্বস্থানে যাহার যে বিভাগ, সে সেই বিভাগে থাকিয়া, তোমরা নিশ্চিতরূপে ভীষ্মদেবকে রক্ষা কর ॥ ১১॥ দুর্য্যোধনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কুরুগণের মধ্যে বৃদ্ধ এবং দুর্য্যোধনের পিতামহ বীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সিংহের ন্যায় উচ্চ শব্দ করিয়া শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১২ ॥ অতঃপর ভীষ্মের শঙ্খনাদ শুনিয়া চারিদিক হইতে গোমুখ, পণব, আনক, শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতি রণবাদ্য সকল বাজিয়া উঠিল এবং সহসা ঐরূপ রণবাদ্য সকল বাজিয়া উঠিলে সেই শব্দ তুমল হইয়া পড়িল ॥ ১৩॥ এদিকে কৌরবদিগের রণবাদ্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন শ্বেতঅশ্বযুক্ত মহারথে থাকিয়া দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৪॥ কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ, বৃকোদর ভীমসেন প্রৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ, ॥ ১৫ ॥ রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামক শঙ্খ, নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ এবং বীর সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৬ ॥

কাশ্য মহেষ্বাস পুন শিখণ্ডী বিখ্যাত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও সাত্যকি অজিত ॥ ১৭ ॥
দ্রৌপদী-তনয়গণ, সৌভদ্র, দ্রুপদে।
পৃথকে পৃথকে এবে সবে শঙ্খ নাদে ॥ ১৮ ॥
বিদরে কৌরব হিয়া সে মিলিত ধ্বনি।
তুমুল ধ্বনিত করি আকাশ মেদিনী ॥ ১৯ ॥
অস্ত্রপাতোন্মুখ হেরি ধার্ত্তরাষ্ট্রে সব।
কপিধ্বজ রথে তবে থাকিয়া পাণ্ডব।
টানিয়া ধনুক কৃষ্ণে কহে হেন রব ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন।

উভ সৈন্যমাঝে কৃষ্ণ! রাখ মম রথ ॥ ২১ ॥
যাবৎ দেখিব আমি যুদ্ধাশয়ে স্থিত।
যুধিব এ রণোদ্যমে কাহার সহিত ॥ ২২ ॥
যুদ্ধার্থে আগত যত হেরিব এ রণে।
দুষ্টবুদ্ধি-দুর্য্যোধন-প্রিয়চারিগণে ॥ ২৩ ॥

মহা ধনুর্দ্ধর কাশীপুত্র ও বিখ্যাত শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও অজিত সাত্যকি ॥ ১৭ ॥ দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সুভদ্রা পুত্র ও দ্রুপদ ইহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৮ ॥ পাণ্ডব পক্ষের সেই মিলিত শঙ্খধ্বনি আকাশ ও পৃথিবী তুমুল প্রতিধ্বনিত করিয়া কৌরবগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ অতঃপর কৌরবগণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া, অর্জ্জুন কপিধ্বজ নামক রথে থাকিয়া, ধনুক টানিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন ॥২০॥ হে কৃষ্ণ! কৌরব ও পাণ্ডব উভয় সেনার মধ্যস্থলে আমার রথ রাখুন ॥২১॥ যতক্ষণ না আমি দেখি—যুদ্ধেচ্ছায় কাহারা আসিয়াছে এবং এরূপ রণ সমুদ্যমে কাহার সহিতই বা যুদ্ধ করিব ॥ ২২ ॥ আর দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধনের কোন্ কোন্ হিতাকাঙ্ক্ষিগণ যুদ্ধার্থে আসিয়াছে ॥ ২৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন।

হৃষীকেশ, গুড়াকেশ বাক্যেতে ভারত।
উভ সৈন্যমাঝে রাখি সমুত্তম রথ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখত রাজগণ যত।
কন হেন, হের পার্থ! কুরু সমবেত ॥ ২৫ ॥
উভ সৈন্যমাঝে পার্থ হেরে আর যত।
খুড়া, জেঠা, ভ্রাতা, পৌত্র, পিতামহ, সুত।
আচার্য্য, মাতুল, সখা, শ্বশুর, সুহৃদ ॥ ২৬ ॥
হেরি পার্থ রণে তবে যত বন্ধুগণ।
মহা কৃপাবিষ্টে হেন সবিষাদে কন ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন।

যুদ্ধেচ্ছায় হেরি কৃষ্ণ! আসীন স্বজন।
গাত্র অবসন্ন মম শুখাল বদন ॥ ২৮ ॥
কম্পিত শরীর মম রোমাঞ্চিত হয়।
দগ্ধ ত্বক্, হস্ত হতে গাণ্ডীব খসয় ॥ ২৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন—হে ভারত! জিতনিদ্র অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে পর, ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ উভয় সৈন্যদলের মধ্যে সমুত্তম্ রথ রাখিয়া ॥ ২৪ ॥ কহিলেন—হে পার্থ! ঐ ভীষ্ম ও দ্রোণ পুরস্কৃত রাজগণ এবং অন্যান্য একত্রিত কৌরবগণ দেখ॥ ২৫ ॥ পৃথাপুত্র অর্জ্জুন উভয় সৈন্য মধ্যে খুড়া, জেঠা, পুত্র, পৌত্র, পিতামহ, ভ্রাতা, আচার্য্য, মাতুল, সখা, শ্বশুর ও অন্যান্য সুহৃদগণকে দেখিলেন ॥২৬॥ অনন্তর কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন এইরূপে রণস্থলে আত্মীয় স্বজন মিত্র বান্ধবাদি দেখিয়া মহা কৃপায় অর্থাৎ আহা কেমন করিয়া ইহাদিগকে বধ করিব এইরূপ দয়াতে আচ্ছন্ন এবং বিষাদে মগ্ন হইয়া কহিলেন ॥ ২৭ ॥ হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় আত্মীয় স্বজনগণ এই রণস্থলে উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া আমার গাত্র অবসন্ন হইতেছে, বদন শুখাইয়া উঠিতেছে॥ ২৮ ॥ আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে, চর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে ও হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে॥ ২৯ ॥

অবস্থানে অসমর্থ, ভ্রান্ত হল মন।
বিপরীত করি কৃষ্ণ! নিমিত্ত দর্শন ॥ ৩০ ॥

শ্রেয় নাহি হেরি বধি স্বজনে আহবে।
চাহি না বিজয়, কৃষ্ণ! রাজ্য, সুখ সবে ॥ ৩১ ॥

রাজ্যে, ভোগে, গোবিন্দ হে! কি ফল জীবনে।
রাজ্য, ভোগ, সুখ কাঙ্খি যাদের কারণে ॥ ৩২ ॥

আসিয়াছে দিতে তারা রণে প্রাণ, ধন।
আচার্য্য, জনক, পুত্র, পিতামহগণ ॥ ৩৩ ॥

সম্বন্ধী, শ্বশুর, মামা, পৌত্র, শ্যালাগণ।
বধিলে না আশি বধ শ্রীমধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

ছার ত্রিলোকের রাজ্য কি মহীভুবন।
কুরুগণ বধে কিবা প্রীতি জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

আমি অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার মন ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। হে কৃষ্ণ! আমি অমঙ্গলজনক লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি॥ ৩০॥ এ যুদ্ধে আত্মীয় স্বজনকে বধ করিয়া কোনরূপ মঙ্গল দেখিতেছি না। অতএব হে কৃষ্ণ! আমি জয়, রাজ্য এবং সুখ সকল চাহি না॥ ৩১॥ হে গোবিন্দ! আমার রাজ্যে,ভোগে ও জীবনেই বা ফল কি? কারণ আমি যাহাদের জন্য রাজ্য ভোগ ও সুখ সকল কামনা করি॥ ৩২॥ সেই সকলেই রণে প্রাণ ও ধন দিতে আসিয়াছে; যথা—আচার্য্য, জনক, পুত্র, পিতামহগণ,॥ ৩৩॥ সম্বন্ধী, শ্বশুর, মামা, পৌত্র, শ্যালকগণ ইত্যাদি। অতএব হে শ্রীমধুসূদন! তাহারা আমাকে বধ করিলেও আমি তাহাদের বধ করিতে ইচ্ছা করি না॥ ৩৪॥ এক মাত্র পৃথিবীর কথা কি কহিতেছেন, ত্রিভুবনও লাভ আমার নিকট তুচ্ছ। অতএব হে জনার্দ্দন! এই সমস্ত কৌরবগণ বধ করিয়া আমার কিইবা আনন্দ হইবে? ৩৫॥

আততায়ী বধি মোরা পাপ আশ্রয়িব।
সবান্ধবে কুরুগণে তবে না বধিব।
স্বজনে বধিলে কৃষ্ণ! কি সুখী হইব ॥ ৩৬ ॥
লোভ-ভ্রষ্ট চিতে তারা না যদি হেরে হে।
কুল-ক্ষয়-কারী দোষ, পাপ মিত্র-দ্রোহে ॥ ৩৭ ॥
পাপ জানি মোরা হব নিবৃত্ত না কেন।
কুল-ক্ষয়-কারী দোষ হেরি জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥
সনাতন কুল-ধর্ম্ম কুল-ক্ষয়ে যায়।
কুল নষ্টে সব কুল অধর্ম্মেরে পায় ॥ ৩৯ ॥
অধর্ম্ম পাইলে কৃষ্ণ! দুষ্টা হয় নারী।
নারী দুষ্টে জন্মে বর্ণসঙ্করের সারি ॥ ৪০ ॥
কুলঘ্নে ও কুলে দেয় সঙ্কর নরকে।
পতিত তাদের পিতৃ লুপ্ত পিণ্ডোদকে ॥ ৪১ ॥

এই আততায়ী অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে উদ্যত যোদ্ধাগণকে বধ করিয়া আমরা পাপ আশ্রয় করিব, অতএব কৌরবগণকে সবান্ধবে বধ করিব না। ফলত ইহাদিগকে বধ করিয়াই বা আমরা কি সুখী হইব? ৩৬॥ হে কৃষ্ণ! যদি কৌরবগণ লোভ কর্ত্তৃক ভ্রষ্ট-মন অর্থাৎ বিপথগামী-মন হইয়া এইরূপ কুলক্ষয়কারী দোষ ও মিত্রবধকারী পাপ না দেখিতে পায় ॥ ৩৭ ॥ হে জনার্দ্দন! আমরা জানিয়া শুনিয়াও কুলক্ষয়কারী দোষ দেখিয়াও কেননা এ সকল পাপ হইতে ক্ষান্ত হইব? ৩৮॥ কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায় এবং কুল নষ্ট হইলে সমুদয় কুল অধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৯ ॥ এইরূপে কুল অধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে নারীগণ দুশ্চরিত্রা হয় এবং নারীগণ দুষ্টা হইলেই বর্ণসঙ্করগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ বর্ণসঙ্করেরা কুলনাশকগণে ও কুলকে নরকে দেয় এবং এইরূপে পিণ্ড ও তর্পণাদি লুপ্ত হইলে তাহাদের পিতৃপুরুষগণও পতিত হয় ॥ ৪১ ॥

এ হেন সঙ্কর-কারী দোষে কুলঘ্নার।
উৎসন্ন শাশ্বত জাতি কুল ধর্ম্ম আর ॥ ৪২ ॥
কুল ধর্ম্ম উৎসন্নেতে শুনি জনার্দ্দন।
নিয়ত নরকে বাস করে নরগণ ॥ ৪৩ ॥
হায় মোরা মহাপাপ করিতে নিশ্চিত।
রাজ্য-সুখ-লোভে বধে স্বজনে উদ্যত ॥ ৪৪ ॥
নিরস্ত্রে, না যুধি মোরে যদি অস্ত্রবান্।
কুরুগণ বধে তবু হইবে কল্যাণ ॥ ৪৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন।

কহি হেন রণে, পার্থ রথে উপবেশে।
ত্যজি শর, চাপ, শোক-সংবিগ্ন-মানসে ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্যা
উদ্বীপক উপনিষৎ স্বরূপ ভগবদ্গীতা
নামক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন
সংবাদে মোহ যোগ নামে
প্রথম অধ্যায়।

সেই কুলনাশকগণের এইরূপ বর্ণসঙ্করকারী দোষে এমন যে নিত্য কুল ও জাতি ধর্ম্ম তৎসমুদয় উৎসন্ন যায় ॥৪২॥ হে জনার্দ্দন! শুনিয়াছি কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যাইলে মনুষ্যগণ সর্ব্বদা নরকে বাস করে॥ ৪৩॥ হায়! আমরা মহাপাপ করিতে দৃঢ় হইয়াছি, যেহেতু রাজ্য ও সুখের লোভে আত্মীয় স্বজনদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি॥ ৪৪॥ আমি অস্ত্রত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিব না বলিলে যদি সশস্ত্রে কৌরবগণ আমাকে বধ করে তাহা হইলেও মঙ্গল হইবে॥ ৪৫ ॥ সঞ্জয় কহিলেন—অর্জ্জুন রণস্থলে এইরূপ কহিয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকেতে অভীভূতচিত্ত হইয়া রথে বসিলেন ॥ ৪৬॥

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গৌড়ীয় গীতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাংখ্য যোগ।

সঞ্জয় কহিলেন।

অশ্রু-পূর্ণাকুল-নেত্র, কৃপাবিষ্ট তথা।
বিষণ্ণ অর্জ্জুনে কৃষ্ণ কন হেন কথা ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

কোথা হতে এ বিষমে এল হে অর্জ্জুন।
অনার্য্য, অস্বর্গ্য মোহ, তব, কীর্ত্তি-হীন ॥ ২ ॥
না হও কাতর পার্থ! অযোগ্য তোমার।
তুচ্ছ হৃদি-দুর্ব্বলতা ত্যাগি উঠ আর ॥ ৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন—অনন্তর অর্জ্জুনকে উক্তরূপে কৃপান্বিত ও কাতর এবং তাঁহার চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া আকুল হইয়াছে দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই সকল কথা কহিলেন ॥ ১ ॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অর্জ্জুন! এই দারুণ সময়ে কোথা হইতে তোমার এইরূপ আর্য্যজনের অনুচিত, স্বর্গের প্রতিবন্ধক এবং কীর্ত্তির বিনাশক মোহ আসিয়া উপস্থিত হইল? ২ ॥ হে অর্জ্জুন! কাতর হইও না, এ সময়ে তোমার কাতর হওয়া উচিত নয়। অতএব হৃদয়ের অতি তুচ্ছ দুর্ব্বলভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে উঠ ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন।

মম পূজনীয় কৃষ্ণ! ভীষ্ম, দ্রোণ সনে।
যুধিব বাণেতে রণে আমি হে কেমনে॥ ৪॥

মহা গুরু হত্যা চেয়ে থাকা ভাল ভিক্ষা খেয়ে
ইহলোকে শ্রেয় হয় তবে।
ভুঞ্জিতে রুধির-ময় অর্থ-কাম-ভোগ-চয়
গুরু বধি এখানেই হবে॥ ৫॥

হইলে মোদের জয় কিম্বা যদি পরাজয়
নাহি জানি শ্রেষ্ঠ বলি কাকে।
যাদের নিধন করি বাঁচিতে না সাধ করি
হেন তারা রয়েছে সম্মুখে॥ ৬॥

কার্পণ্যে ও দোষে মোর স্বভাব হয়েছে ঘোর
ধর্ম্ম-অন্ধ আর মোর চিত।
জিজ্ঞাসি যা শ্রেয় হবে আশ্রিত শিষ্যেরে তবে
শিখাইতে কহ সুনিশ্চিত॥ ৭॥

অর্জ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ! কেমন করিয়া আমি আমার পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সহিত এই যুদ্ধে বাণ দ্বারা যুদ্ধ করিব? ৪॥ মহাগুরুগণ বধ করা অপেক্ষা এই পৃথিবীতে ভিক্ষান্ন খাইয়া বাচিয়া থাকাও শ্রেয়। কারণ গুরুজন বধ করিলে, পরলোকের ত কথাই নাই, ইহলোকেই তাহাদের রক্তপাত করিয়া প্রাপ্ত, সুতরাং রক্তমাখা অর্থ, কাম্য ও ভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিতে হইবে॥ ৫॥ এই যুদ্ধে আমাদের জয়ই হউক বা পরাজয়ই হউক, এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টীকে শ্রেষ্ট বলা যায় তাহা জানি না, কারণ যাহাদিগকে বধ করিয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, সেই সমস্ত আত্মীয়েরাই সম্মুখে রহিয়াছে॥৬॥ কাতরতা ও কুলক্ষয়কারী দোষে আমার স্বভাব আচ্ছন্ন হইয়াছে এবং আমার চিত্ত ধর্ম্ম বিষয়ে অন্ধ হইয়াছে—অর্থাৎ আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান রহিত হইয়াছি। অতএব হে কৃষ্ণ! আমার পক্ষে এক্ষণে যাহা শ্রেয়স্কর তাহাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি আপনার শরণাগত শিষ্য, অতএব সেই সকল বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন॥ ৭॥

কিসে আর নাহি হেরি ইন্দ্রিয়-শোষণ-কারী
হেন শোক হবে মোর গত।
নিষ্কণ্টক পৃথ্বীতলে সুসমৃদ্ধ রাজ্য পেলে,
পেলে কিবা দেব-আধিপত্য ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন।

হেন কথা গুড়াকেশ কহি হৃষীকেশে।
না যুঝি গোবিন্দ! বলি মৌন হয়ে বসে ॥ ৯ ॥
হৃষীকেশ কন তবে সহাস্য আননে।
উভ সৈন্যমাঝে হেন বিষণ্ণ অর্জ্জুনে ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

অশোচ্যে করহ শোক, বিজ্ঞ কও মুখে।
মৃত বা জীবিত লাগি পণ্ডিত না দুখে ॥ ১১ ॥
আমি, তুমি, রাজগণ না ছিলাম নয়।
পরেও আমরা সবে না রহিব নয় ॥ ১২ ॥

আমি এই পৃথিবীতে বিঘ্নবিহীন ও সম্পত্তিশালী রাজ্য পাইলে অথবা স্বর্গের রাজা হইলেও, কি প্রকারে আমার এই ইন্দ্রিয় শোষণ-কারী আত্মীয়-বিয়োগ-জনিত শোক দূর হইবে তাহা দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৮ ॥ সঞ্জয় কহিলেন—গুড়াকেশ অর্জ্জুন হৃষীকেশ কৃষ্ণকে এইরূপ কহিয়া—হে গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করিব না—এই কথা বলিয়া স্থির ভাবে রথোপরি বসিলেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর অর্জ্জুনের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, হৃষীকেশ হরি সহাস্য বদনে সেই কুরু-পাণ্ডব সৈন্যের মধ্যস্থলে কাতর অর্জ্জুনকে কহিলেন ॥ ১০ ॥ হে অর্জ্জুন! তুমি, যাহার জন্য শোক করা উচিত নয়, সেই অবিনাশী আত্মার জন্যই শোক করিতেছ, অথচ মুখে বিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় কথা কহিতেছ। পণ্ডিতেরা কি মৃত কি জীবিত কাহারও নিমিত্তই দুঃখ করেন না ॥ ১১ ॥ আমি, তুমি ও এই রাজগণ ইহার পূর্ব্বে ছিলাম না, এমন নহে এবং আমরা ইহার পরেও যে থাকিব না, তাহাও নহে অর্থাৎ আমরা সকলেই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে, রূপ রূপান্তরে বর্ত্তমান আছি ॥ ১২ ॥

কৌমার যৌবন জরা যথা দেহি-দেহে।
দেহান্তর-প্রাপ্তে তথা, ধীর মুগ্ধ নহে ॥ ১৩ ॥
স্পর্শ-মাত্র শীত, উষ্ণ, সুখ, দুখ, হয়।
হয় আর যায়,সহ অনিত্য সে তায় ॥ ১৪ ॥
যে পুরুষ হেনরূপে ব্যথিত না রয়।
সুখে-দুখে-সম, ধীর মোক্ষ যোগ্য হয় ॥ ১৫ ॥
অসতের নাহি ভাব, সৎ না অভাবে।
উভয়ে নির্ণয়ে হেন তত্ত্ব-দর্শী সবে ॥ ১৬ ॥
সর্ব্ব-ব্যাপ্ত যিনি, জেনো, অবিনাশী তাঁরে।
এ হেন অব্যয়ে নাশ কার সাধ্য করে ॥ ১৭ ॥

এই দেহে দেহী যেরূপ কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্যরূপ অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এক দেহের বিনাশে দেহীর অন্য দেহ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব ধীর ব্যক্তি তদ্বিষয়ে মোহিত হন না ॥ ১৩ ॥ স্পর্শ বা সংযোগ মাত্রেই শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বিষয় সকল অনুভূত হইয়া থাকে, সুতরাং সে সমস্ত কখন আবির্ভূত কখন বা তিরোভূত হয়। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি এই অনিত্য সম্বন্ধ সকল সহ্য কর ॥ ১৪ ॥ যে পুরুষকে এইরূপ শীত উষ্ণাদি সম্বন্ধ সকল ক্লিষ্ট করিতে না পারে, সেই পুরুষ সুখে ও দুঃখে সমভাবে অবস্থান করে, এবং সেই ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিই মোক্ষের উপযুক্ত পাত্র ॥ ১৫ ॥ অসৎ বস্তুর ভাব অর্থাৎ সত্ত্বা বা স্থায়িত্ব নাই এবং সৎ বস্তুরও কখন অভাব বা স্থায়িত্বের লোপ হয় না অর্থাৎ অসৎ কখন এক ভাবে থাকে না এবং সতেরও কখন ভাবান্তর হয় না ॥ ১৬ ॥ অতএব যিনি এইরূপ সৎহেতু সর্ব্বব্যাপ্ত, তাঁহাকে ধ্বংসহীন বলিয়া জানিও, সুতরাং সেই অক্ষয় পদার্থকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

অন্তবান্ দেহ, দেহী নিত্য অবিনাশী।
অপ্রমেয়, তবে হও ভারত রণাশী ॥ ১৮ ॥
যে জানে তাঁহারে হন্তা, হত যেবা আর।
অজ্ঞ দোঁহে, নাশে না হে! নাশ নাহি তাঁর ॥ ১৯ ॥
জনম মরণ তাঁর কভু নাহি হয় আর
পুন-জাত-বৃদ্ধ নাহি হয়।
নিত্য, অজ, সে শাশ্বত পুরাণ না হয় মৃত
এ শরীর হইলেও ক্ষয় ॥ ২০ ॥
অব্যয়, অনাশী, নিত্য, অজ, যেবা জানে।
হানিতে আদেশে কাকে, কারে আর হানে ॥ ২১ ॥
জীর্ণ বাস ছাড়ি পরে নূতনে গ্রহণ করে
যেই মত যত নরগণ।
ত্যজি জীর্ণ কলেবর দেহী, নব দেহান্তর
সেই মত করয়ে গ্রহণ ॥ ২২ ॥

এই দেহ ধ্বংসশীল, কিন্তু দেহী অর্থাৎ দেহ মধ্যস্থ আত্মা নিত্য অর্থাৎ ভাবান্তর রহিত, অবিনাশী অর্থাৎ নাশ রহিত, এবং অপ্রমেয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৮ ॥ হে অর্জ্জুন! যে তাঁহাকে অন্য কর্ত্তৃক হত ও যে তাঁহাকে অপরের হত্যা-কারী বলিয়া জানে, তাহারা উভয়েই মূর্খ, কারণ তিনি কাহাকেও হত্যা করেন না এবং কেহ তাঁহাকেও হত্যা করে না ॥ ১৯ ॥ তাঁহার কখন জন্ম বা মৃত্যু হয় না, কিম্বা তিনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না। সেই নিত্য অর্থাৎ ভাবান্তর-রহিত, অজ অর্থাৎ জন্ম-রহিত, শাশ্বত অর্থাৎ বিনাশ-বিহীন এবং পুরাণ অর্থাৎ অনাদি পুরুষের, দেহ নষ্ট হইলেও, ধ্বংস নাই ॥ ২০ ॥ হে অর্জ্জুন! তাঁহাকে যে অক্ষয়, অবিনশ্বর, নিত্য এবং অজ বলিয়া জানে, সে কাহাকেই বা মারিতে আজ্ঞা করিবে এবং কি জন্যই বা স্বয়ং কাহাকেও হত্যা করিবে ॥ ২১ ॥ মনুষ্যগণ যেরূপ পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ হইলে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী এই দেহ জরায় জীর্ণ হইলে অপর এক নূতন দেহ ধারণ করেন ॥ ২২ ॥

অস্ত্রে নাহি ছিন্ন হয়, পাবকে না ভস্মে।
জলেতে না ক্লিন্ন হয়, মারুতে না শোষে ॥ ২৩ ॥
অচ্ছেদ্য, অদাহ্যাক্লিদ্য, অশোষ্য সে জন।
সর্ব্বগতাচল, নিত্য, স্থাণু, সনাতন ॥ ২৪ ॥
অব্যক্ত, অচিন্ত্য, তিনি অবিকারী উক্ত।
হেন জানি শোক তবে নহে ত উচিত ॥ ২৫ ॥
নিত্য-জাত, তাঁরে যদি ভাব, নিত্য-মৃত।
তথাপি হে মহাবাহু! শোক না উচিত ॥ ২৬ ॥
জন্মিলে মরণ ধ্রুব, মরিলে জনম।
শোক না উচিত যদি অখণ্ড নিয়ম ॥ ২৭ ॥

তাঁহাকে অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করা যায় না, তিনি অগ্নিতে ভস্ম হন না, জলে ক্লেদযুক্ত বা রসাক্ত হন না এবং বায়ু কর্ত্তৃকও শোষিত হন না ॥ ২৩ ॥ অতএব তিনি অচ্ছেদ্য অর্থাৎ ছিন্ন হন না, অদাহ্য অর্থাৎ দগ্ধ হন না, অক্লিদ্য অর্থাৎ ক্লেদযুক্ত হন না, অশোষ্য অর্থাৎ শুষ্ক হন না, সর্ব্বগত অর্থাৎ সকলে বিদ্যমান, অচল অর্থাৎ বিচলিত হন না, নিত্য অর্থাৎ ভাবান্তর রহিত, স্থাণু অর্থাৎ স্থির, সনাতন অর্থাৎ অনাদি ॥ ২৪ ॥ অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার অতীত এবং অবিকারী অর্থাৎ বিকার বিহীন বলিয়া উক্ত হন। অতএব হে অর্জ্জুন! আত্মীয় বধের জন্য তুমি আব শোক করিও না, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ২৫ ॥ হে মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন! তুমি যদি জীবাত্মাকে দেহাদির ন্যায় নিয়ত জাত ও মৃত বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলেও তোমার এরূপ আত্মীয়-বিয়োগ-জনিত শোকে শোকাকুল হওয়া কর্ত্তব্য নয় ॥ ২৬ ॥ যাহার উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশ আছে এবং যাহার ধ্বংস আছে তাহার পুনরুৎপত্তিও আছে ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত, তবে মৃত ব্যক্তির জন্য কদাচ শোক করা উচিত নহে ॥ ২৭ ॥

আদিতে অব্যক্ত ভূত, ব্যক্ত মধ্যে যত।
নিধনে অব্যক্ত যদি, শোক কেন এত ॥ ২৮ ॥

আশ্চর্য্যে কেহ বা হেরে অন্য নরে কহে পরে
আশ্চর্য্যের সহিত তাঁহারে।
আর কোন অন্য জনে আশ্চর্য্য সহিত শুনে
শুনিয়া বুঝিতে কত নারে ॥ ২৯ ॥

দেহী, সর্ব্ব দেহে নিত্য অবধ্য, ভারত।
সর্ব্বভূত লাগি তবে শোক না উচিত ॥ ৩০ ॥

স্বধর্ম্মে হেরিলে নহে উচিত কম্পন।
শ্রেয় নাহি অন্য ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের রণ ॥ ৩১ ॥

যদৃচ্ছা-আগত, সুখী ক্ষত্রই লাভ করে।
মুক্ত-স্বর্গ-দ্বার-সম এ হেন সমরে ॥ ৩২ ॥

ভূতগণ আদিতে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অপ্রকাশিত থাকে, মধ্যে মাত্র অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত থাকে, এবং পুনরায় নিধনে অর্থাৎ মৃত্যুর পরও অপ্রকাশিত থাকে। অতএব হে অর্জ্জুন! তবে কাহারও জন্য শোক করা উচিত নয় ॥ ২৮ ॥ কেহ এই দেহীকে আশ্চর্য্যের সহিত দর্শন করিতেছে; কেহবা ইঁহাকে আশ্চর্য্যের সহিত কীর্ত্তন করিতেছে, কেহ বা ইঁহাকে আশ্চর্য্যের সহিত শ্রবণ করিতেছে, আর কেহবা ইঁহাকে শুনিয়াও বুঝিতে পারিতেছে না ॥ ২৯ ॥ হে ভরতবংশজ অর্জ্জুন! দেহী এই দেহে সর্ব্বদা অবধ্যভাবে রহিয়াছেন। অতএব কাহারও বধের জন্য শোক করা উচিত নয় ॥ ৩০ ॥ হে অর্জ্জুন! তুমি যদি তোমার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণোপযুক্ত ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তাহা হইলেও তোমার আত্মীয়-বধ-শোকে কম্পিত হওয়া উচিত নয়, কারণ ক্ষাত্রয়ের যুদ্ধই ধর্ম্ম, যুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের অন্য ধর্ম্ম নাই ॥ ৩১ ॥ সুখী ক্ষত্রিয়গণই যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত মুক্তস্বর্গদ্বারের ন্যায় এইরূপ যুদ্ধলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

হেন ধর্ম্ম-রণ যদি না করহ তবে।
ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম, কীর্ত্তি, পাপগ্রস্ত হবে ॥ ৩৩ ॥
অব্যয় অকীর্ত্তি তব ঘোষিবে সমাজে।
সক্ষমে অকীর্ত্তি আর মৃত্যুচেয়ে বাজে ॥ ৩৪ ॥
ভীত ভাবি লঘু জ্ঞান মহারথিগণ।
করিবে তোমারে, যারা করে বহু মান ॥ ৩৫ ॥
অবাক্য বলিবে কত শত্রুযোগ পেয়ে।
সামর্থে নিন্দিবে, দুঃখ কি আছে এ চেয়ে ॥ ৩৬ ॥
মরিলে পাইবে স্বর্গ, মহী-ভোগ জিয়ে।
উঠ তবে এবে যুদ্ধে নিশ্চয় হইয়ে ॥ ৩৭ ॥
সুখে, দুঃখে, জয়াজয়ে, সম, লাভালাভে।
করি, রণে উঠ, ইথে পাপ নাহি হবে ॥ ৩৮ ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি যদি এই উপস্থিত ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বীয় ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপ গ্রহণ করিবে ॥ ৩৩ ॥ লোক-সমাজে তোমার চিরকালের জন্য অখ্যাতি ঘোষিত হইবে। সক্ষম ব্যক্তির এইরূপ অখ্যাতি, মৃত্যু অপেক্ষাও দুঃখকর ॥ ৩৪ ॥ হে অর্জ্জুন! যে সকল মহারথিগণ তোমাকে এক্ষণে বহু সম্মান করিয়া থাকে, তুমি প্রাণ ভয়ে রণে পরাঙ্মুখ হইয়াছ ভাবিয়া, তাহারাই তোমাকে উপেক্ষা করিবে ॥ ৩৫ ॥ শত্রুগণ সূত্র পাইয়া তোমাকে কত কটু কথা কহিবে এবং তোমার সামর্থকে নিন্দা করিবে। অতএব ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে ॥ ৩৬ ॥ হে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন! তুমি এই যুদ্ধে মরিলে স্বর্গ পাইবে এবং জীবিত থাকিলে জয়ী হইয়া রাজ্যভোগ করিবে অতএব নিসন্দিগ্ধ চিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩৭ ॥ হে অর্জ্জুন! তুমি সুখ ও দুঃখ, জয় ও অজয়, এবং লাভ ও অলাভ সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে আর পাপভাগী হইবে না ॥ ৩৮ ॥

কহিনু, সাংখ্যের যোগ, শুন অন্য যোগে।
কর্ম্ম-ফাঁস হবে নাশ, যুগিলে যে যোগে ॥ ৩৯ ॥
প্রত্যবায় নাহি ইথে, নিস্ফল না হয়।
স্বল্পমাত্র হেন ধর্ম্ম, ত্রাণে মহাভয় ॥ ৪০ ॥
স্থির বুদ্ধি একমাত্র শুন কুরু-সুত।
অনন্ত অস্থির বুদ্ধি বহু-শাখা-যুত ॥ ৪১ ॥
আপাত-পুষ্পিত বাক্যে বহুত বাখানি।
বেদ-বাদ-রত মূঢ়, অন্যে নাহি মানি ॥ ৪২ ॥
ভোগৈশ্বর্য্য-জন্ম-কর্ম্ম-ফল-প্রদ ক্রিয়া।
কামাসক্ত, স্বর্গ-কামী, কহে বাড়াইয়া ॥ ৪৩ ॥

হে অর্জ্জুন! এই তোমাকে সাংখ্যে অর্থাৎ সম্যক্ বস্তুতত্ত্ব নির্ণয়ে, যেরূপ বুদ্ধি চালনা করিতে হয়,তাহাই কহিলাম। এক্ষণে কিরূপে অন্য যোগে—অর্থাৎ সেই বস্তু সকলের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহাদিগের ব্যবহাররূপ যোগে—বুদ্ধির পরিচালনা করিতে হয়, তাহাই কহিতেছি শ্রবণ কর। এ যোগে বুদ্ধি যোগ করিলে, লোকে কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥ ৩৯ ॥ এই যোগের অনুষ্ঠান করিলে কোন প্রকার প্রত্যবায় সম্ভাবনা নাই, ফলত ইহা কখনও নিস্ফল হয় না। এই যোগ অল্পমাত্র সাধন করিলেও মহা ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ॥ ৪০ ॥ হে কুরু-নন্দন অর্জ্জুন! স্থির বুদ্ধি একমাত্র হইয়া থাকে—অর্থাৎ বিষয়ান্তরে বিচলিত না হইয়া এক সীমায় নির্দ্দিষ্ট বা একনিষ্ঠ থাকে, কিন্তু অস্থির বা চঞ্চল বুদ্ধি অনন্ত ও বহুশাখাযুক্ত অর্থাৎ ক্রমাগত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণ করিতেছে বলিয়া তাহার সীমা নাই ॥ ৪১ ॥ হে অর্জ্জুন! মূঢ় ব্যক্তিগণ যাহারা বেদের অন্তর্গত ফলপ্রদায়ক কর্ম্মসমূহে আসক্ত এবং বৈদিক কাম্যকর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছুই মানে না, তাহারাই আপাতত মনোহর বাক্যে মুগ্ধ হয় ॥ ৪২ ॥ সেই কামনাপূর্ণ স্বর্গলোভী ব্যক্তিগণ উত্তম জন্ম, উত্তম ফল, উত্তম ভোগ ও ঐশ্বর্য্য প্রদানকারী ক্রিয়া সকলেরই প্রশংসা করে ॥ ৪৩ ॥

ভোগৈশ্বর্য্যাসক্ত, যার চিত হৃত তায়।
সমাধিতে স্থির বুদ্ধি, তার নাহি হয়॥ ৪৪॥
ত্রিগুণাত্ম বেদ, হও নির্গুণ, সুবীর!
নির্দ্বন্দ্ব, নির্যোগক্ষেম, অপ্রমত্ত, ধীর॥ ৪৫॥
ক্ষুদ্র জলে যত ফল, সিদ্ধ এক হ্রদে।
বিজ্ঞাত ব্রাহ্মণ হেন, সিদ্ধ সর্ব্ব বেদে॥ ৪৬॥
কর্ম্মে হ'ক্ অধিকার, ফল-ভোগী নও।
ফল-হেতু নও, কর্ম্ম ছাড়া নাহি রও॥ ৪৭॥

যাহারা এইরূপে ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত, সুতরাং যাহাদের চিত্ত ভোগ ও ঐশ্বর্য্য কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা ভোগৈশ্বর্য্য ব্যতীত আর কিছুই জানে না, তাহাদিগের বুদ্ধি সমাধিতে স্থির হয় না—অর্থাৎ চিত্ত-তন্ময় হয় না॥ ৪৪॥ হে সুবীর অর্জ্জুন! বৈদিক কর্ম্মসকল সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণে মণ্ডিত, অতএব তুমি নির্গুণ অর্থাৎ নিষ্কাম হও, নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ শীত উষ্ণাদিতে অক্ষুব্ধ হও, নির্যোগক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্য বস্তু পাইবাব এবং প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা করিবার একান্ত ইচ্ছা শূন্য হও এবং ধীর হও অর্থাৎ সর্ব্বদা ধৈর্য্য অবলম্বন কর॥ ৪৫॥ হে অর্জ্জুন! স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় সকল জীবের যত জলাভাব মোচন করে, একমাত্র হ্রদে সমধিক জল থাকাতে, সেই সমস্ত কার্য্যই সুসিদ্ধ হয়; সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী একমাত্র বিজ্ঞান বা বুদ্ধিতত্ত্ব বলে বেদোক্ত সমুদয় তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন॥ ৪৬॥ হে অর্জ্জুন! তোমার কর্ম্মে অধিকার হউক, কর্ম্মের ফলে যেন অধিকার না থাকে অর্থাৎ কর্ম্ম কর, কিন্তু ফল কামনা করিও না। তুমি কদাচ কর্ম্ম-ফলের হেতু বা কারণ হইও না, অথচ কর্ম্ম পরিত্যাগও করিও না অর্থাৎ—করিতে হয় করিতেছি—ভাল হয় হউক—মন্দ হয় হউক—এইরূপ ভাবিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর॥ ৪৭॥

যোগে থাকি কর কর্ম্ম, ত্যাগি সঙ্গ-ভোগ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধি সম ভাবি, সমত্বই যোগ ॥ ৪৮ ॥
বুদ্ধি-যোগ হতে, পার্থ! কর্ম্ম অতি হীন।
বুদ্ধির শরণ লও, ফল-কামী দীন ॥ ৪৯ ॥
সুকৃতি, দুষ্কৃতি, ইহ বুদ্ধি-যুক্ত ত্যাগে।
কর্ম্মের কৌশল যোগ, যুক্ত হও যোগে ॥ ৫০ ॥
বুদ্ধি-যুক্ত তেয়াগিয়া কর্ম্ম-ফল যত।
জন্ম-বন্ধ মুক্তে পায় অনাময় পদ ॥ ৫১ ॥

আসক্তি ত্যাগ করিয়া বুদ্ধির একাগ্রতা সাধন পূর্ব্বক, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমান ভাবিয়া কর্ম্ম কর। এইরূপ সমতাকেই যোগ কহে ॥ ৪৮ ॥ হে অর্জ্জুন! বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম্ম অতি হেয়—অর্থাৎ একাগ্র বুদ্ধিতে স্পৃহাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা অতীব আনন্দদায়ক সুতরাং উত্তম, এবং অনন্ত কামনার বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করা—কাম্য বস্তু প্রাপ্তে ক্ষণিক সুখ লাভ হইলেও—অত্যন্ত দুঃখজনক সুতরাং নীচ। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি বুদ্ধির শরণাপন্ন হও—অর্থাৎ বিবেকী হও, কারণ ফলকামী ব্যক্তিগণ অতিশয় দরিদ্র—অর্থাৎ আশাবশে কেবলমাত্র বিষয়ের নিকট ভোগ প্রার্থনা করিতেছে ॥ ৪৯ ॥ বিবেকী পুরুষগণ ইহলোকে পুণ্য ও পাপ দুই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা কি সঙ্কল্প কবিয়াই বা পুণ্য সঞ্চয় করিবেন? আর কি লোভেই বা পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন? হে অর্জ্জুন! মনকে কৌশলে নির্লিপ্ত রাখিয়া কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় সকলকে কর্ম্মে নিযুক্ত করার নাম যোগ। অতএব তুমি যোগে যুক্ত হও ॥ ৫০ ॥ বিবেকী ব্যক্তিগণ কর্ম্মফল পরিত্যাগপূর্ব্বক জন্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, সর্ব্ব-উপদ্রব-শূন্য বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ পরমানন্দ মোক্ষ লাভ করেন ॥ ৫১ ॥

পার হবে যবে তব বুদ্ধি মোহ-বন।
নির্ব্বেদ হইবে শ্রুত, শ্রোতব্য, তখন ॥ ৫২ ॥
বেদাচ্ছন্ন বুদ্ধি যবে নিশ্চল হইবে।
সমাধিতে অবিচল, তবে যোগ পাবে ॥ ৫৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন।

সমাধিস্থ স্থিত-প্রজ্ঞ কহে, কৃষ্ণ! কারে?
ভাষণ, আসন, কিবা, গমন, সে করে? ৫৪ ॥
মনোগত কাম সব ত্যাগ করে যেই।
আত্মাতেই-তুষ্ট-আত্মা, স্থিত-প্রজ্ঞ সেই ॥ ৫৫ ॥

হে অর্জ্জুন! যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ বন পার হইবে অর্থাৎ যখন তুমি মোহশূন্য হইবে, তখন তুমি শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে বেদশূন্য হইবে অর্থাৎ তোমার আর জ্ঞাত হইবার কিছুই থাকিবে না—মোহ ঘুচিলেই বিশুদ্ধ জ্ঞানে অবস্থান করিবে, অতএব জ্ঞানের কখন জ্ঞানাভাব থাকিবে না ॥ ৫২ ॥ যখন তোমার বৈদিক সকাম কর্ম্মে আসক্ত বুদ্ধি স্থির হইবে এবং সমাধিতে অচল হইবে অর্থাৎ যখন তোমার বুদ্ধি কামনা শূন্য হইয়া একমাত্র জ্ঞানে অবস্থান করিবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৩ ॥ অর্জ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ! সমাধিতে অবস্থিত স্থিত-প্রজ্ঞ অর্থাৎ তন্ময় স্থির-বুদ্ধি-যক্ত ব্যক্তি কাহাকে কহে? তাঁহার বাক্যই বা কিরূপ? তিনি কিরূপে অবস্থান করেন? এবং তাঁহার গতিবিধিই বা কিরূপ? ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীহরি উত্তর করিলেন। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি মনোগত কামনা সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যাঁহার আত্মা আত্মাতেই সন্তুষ্ট অর্থাৎ যাঁহার অন্তর, অন্তরস্থ আত্মাকে পূর্ণ-আনন্দ-ভবন জ্ঞানে বিষয়ান্তরে অনুরক্ত না হইয়া অন্তরেই তুষ্ট, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ কহে ॥ ৫৫ ॥

দুঃখে-অনুদ্বিগ্ন-মন, সুখে-স্পৃহা-হীন।
সে মুনি স্থিত-ধী রাগ-ভয়-ক্রোধ-হীন॥ ৫৬॥
সর্ব্বত্র না রাখে স্নেহ, শুভাশুভে আর।
নাহি হর্ষে, নাহি দ্বেষে, প্রজ্ঞা স্থিত তার॥ ৫৭॥
টানয়ে যে জন কূর্ম্ম-অঙ্গ সম যত।
ইন্দ্রিয় বিষয় হতে, তার প্রজ্ঞা স্থিত॥৫৮॥
নিরাহারে রস ছাড়ি, নিবৃত্ত বিষয়।
ব্রহ্ম হেরি হেন রস আপনি ঘুচয়॥ ৫৯॥
বুদ্ধিমান্ পুরুষের যত্নেও কৌন্তেয়।
বলেতে হরয়ে মন প্রমত্ত ইন্দ্রিয়॥ ৬০॥

যিনি দুঃখ উপস্থিত হইলে বিহ্বল হন না এবং যিনি সুখেও দৃক্পাত করেন না, যিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ শূন্য হইয়াছেন, সেই মুনিই স্থিতধী অর্থাৎ তাঁহারই বুদ্ধি স্থির হইয়াছে॥ ৫৬॥ কোন বিষয়েই যাঁর মমতা নাই। যিনি শুভ বিষয়ে আহ্লাদিত হন না এবং অশুভ বিষয়েও দুঃখিত হন না, তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থির॥ ৫৭॥ কচ্ছপ যেরূপ খোলার ভিতরে আপন অঙ্গ গুটাইয়া লয়, যে ব্যক্তি সেইরূপ আপনার ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আপনার বশে আনয়ন করেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থির॥ ৫৮॥ অনাহারে ইন্দ্রিয় সকল শক্তিহীন হইলে বিষয় উপভোগ করিতে অসমর্থ হয়—অর্থাৎ চক্ষু দেখিতে অক্ষম, পদ নড়িতে অশক্ত—ইত্যাদি রূপে জীবের বিষয় নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু দর্শন, গমনাদির ইচ্ছার অবসান হয় না। কিন্তু জ্ঞানরূপী পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে সে স্পৃহাও দূরীভূত হয়॥ ৫৯॥ হে অর্জ্জুন! বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলেও চঞ্চল ইন্দ্রিয় সকল বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের মন হরণ করিয়া থাকে॥ ৬০॥

সংযমি সবায়, মোতে যুক্ত করি চিত।
বশেতে ইন্দ্রিয় যার, প্রজ্ঞা তার স্থিত ॥ ৬১ ॥
বিষয়ের ধ্যানে সঙ্গ পুরুষের জুটে।
সঙ্গে সমুৎপন্ন কাম, কামে ক্রোধ উঠে ॥ ৬২ ॥
ক্রোধ হতে জন্মে মোহ, মোহে স্মৃতি ভ্রষ্ট।
স্মৃতি ভ্রমে বুদ্ধি নাশ, বুদ্ধি নাশে নষ্ট ॥ ৬৩ ॥
রাগ, দ্বেষ ছাড়ি, চালি ইন্দ্রিয় বিষয়ে।
আত্মবশে যতি যায় প্রসাদ আলয়ে ॥ ৬৪ ॥
প্রসন্ন হইলে সব দুঃখ হয় গত।
প্রসন্ন-চেতার বুদ্ধি আশু হয় স্থিত ॥ ৬৫ ॥

অতএব যিনি উক্তরূপে প্রমত্ত ইন্দ্রিয় সকলকে সংযম করিয়া, আমাতে চিত্ত সংযোগপূর্ব্বক, তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৬১ ॥ হে অর্জ্জুন! বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি হইতে প্রাপ্তির ইচ্ছা বা কামনার উদয় হয়। কামনা হইতেই ক্রোধ জন্মে ॥ ৬২ ॥ ক্রোধ হইতে মোহ বা হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্যতা উপস্থিত হয়। মোহ হইতে—কি করিতেছি, কি করিলে কি হয়—ইত্যাদিরূপ স্মরণ শক্তির লোপ হয়। স্মৃতিভ্রষ্ট হইলেই বুদ্ধিহীন হয় এবং বুদ্ধি নাশ হইলে জীবগণ উৎসন্ন যায় ॥ ৬৩ ॥ যতি অর্থাৎ সংযমী পুরুষ আসক্তি ও দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় উপভোগ করত, আত্মবশ হেতু পরমানন্দময় ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হন ॥ ৬৪ ॥ এইরূপে আনন্দলাভ করিলে প্রসন্ন ব্যক্তির সমস্ত দুঃখ শীঘ্রই দূর হইয়া বুদ্ধি স্থির হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

অযুক্তের নাহি বুদ্ধি, নাহিক ভাবনা।
অভাবী অশান্ত, সুখ অশান্ত জানে না ॥ ৬৬ ॥
মন যার, ইন্দ্রিয়ের বশ ইচ্ছাচারী।
হরে তার প্রজ্ঞা যেন বাহাহত-তরি ॥ ৬৭ ॥
সকল ইন্দ্রিয় তাই যার নিগৃহীত।
বিষয় হইতে, প্রজ্ঞা তার প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬৮ ॥
সর্ব্ব-ভূত-নিশা যবে, সংযমী জাগ্রতি।
ভূতগণ জাগে যবে মুনিদের রাতি ॥ ৬৯ ॥

অবিবেকী ব্যক্তির বুদ্ধি নাই সুতরাং বিবেচনা করিতে বা বস্তুতত্ত্ব ভাবিতে অসমর্থ। অচিন্তাশীল ব্যক্তি আপাতত মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইয়া লোভ বশত শান্ত হইতে পারে না এবং অশান্ত ব্যক্তি কখন প্রকৃত সুখ বা পরমানন্দ লাভ করিতে পারে না ॥ ৬৬ ॥ যাহার মন যথেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয় সকলের বশীভূত, সমুদ্র মধ্যে বায়ু-কর্তৃক আহত নৌকার ন্যায়, তাহারা তাহার বুদ্ধিকে হরণ করে— অর্থাৎ সে ক্রমাগত ইন্দ্রিয় সকলকে চরিতার্থ করিবার জন্য এই ঘোর ভবার্ণবে আশাবশে অবিশ্রান্ত ঘুরিতে থাকে ॥ ৬৭ ॥ হে অর্জ্জুন! যাহার ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে সংযত, তাহারই প্রজ্ঞা স্থিত ॥ ৬৮ ॥ যখন সকলের রাত্রিযোগে নিদ্রা, তখন সংযমীর দিবাযোগে জাগরণ, এবং যখন সকলে জাগিয়া থাকে, তখন মুনি বা মননকারীদিগের রাত্রিকাল অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে ইতর সাধারণে মোহান্ধকারে নিদ্রারূপ অজ্ঞানে অভিভূত থাকে, তৎসমুদয় সংযমী জ্ঞানরূপ দিব্য আলোকে চাক্ষুষ করিয়া থাকেন, এবং যখন সকলে আপাতত মনোহর মায়া আলোকে দিশেহারা হইয়া যে সকল অস্থির বিষয়ে অস্থির ভাবে ঘুরিতে থাকে, মুনিগণ সেই সকল ক্ষণিক বিজ্ঞান বা ক্ষণভঙ্গুর সুখ হইতে অন্তর থাকিয়া নিদ্রিতের ন্যায় অসংস্পৃষ্টভাবে অবস্থান করেন ॥ ৬৯ ॥

অচল-প্রতিষ্ঠ, ভরা সমুদ্রে যেমতি ত্বরা
যত জল প্রবেশিত হয়।
কামনা সকল যাতে প্রবেশিত হেন মতে
সেই শান্ত, কাম-কামী নয়॥ ৭০॥
তেয়াগি কামনা যেবা নিস্পৃহে বিচরে।
নির্ম্মমে, নিরহঙ্কারে, শান্তি তার করে॥ ৭১॥
এই ব্রাহ্মী-স্থিতি, পার্থ! প্রাপ্তে মুগ্ধ নয়।
অন্তে ব্রহ্মে স্থিত, ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ সে পায়॥ ৭২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্যা উদ্দীপক
উপনিষৎস্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সাংখ্যযোগ নামে
দ্বিতীয় অধ্যায়।

যেরূপ স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা রহিত এবং পরিপূর্ণ সমুদ্রে যাবতীয় জল আসিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাহাতে কামনা সকল প্রবিষ্ট হয় এবং সে শান্তি লাভ করে; কিন্তু কামনাপরায়ণ ব্যক্তি কদাচ শান্তি প্রাপ্ত হয় না—কারণ ত্যাগীর নিকট কামনা মাত্রই তুচ্ছ অতএব কি কামনা করিয়া তিনি অস্থির হইয়া বেড়াইবেন? কিন্তু যাহারা কামনার বশবর্ত্তী, তাহারা ক্রমাগত আশাবশে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিতেছে, সুতরাং কেমন করিয়া শান্তি পাইবে?॥ ৭০॥ যে ব্যক্তি কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক স্পৃহাশূন্য, মমতা রহিত ও অহঙ্কার বিহীন হইয়া বিচরণ করেন তিনিই শান্তিপ্রাপ্ত হন॥ ৭১॥ হে অর্জ্জুন! ইহাকেই ব্রাহ্মীস্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থান কহে। ব্রহ্মে অবস্থান করিলে আর সংসাররূপ মোহ বন্ধনে মুগ্ধ হইতে হয় না। এমন কি, যদি কেহ অন্তকালেও মনকে শূন্য করিয়া নিষ্কামচিত্তে শুদ্ধ জ্ঞানরূপী ব্রহ্মে অবস্থান করিতে পারেন, তাহা হইলেও তিনি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ—অর্থাৎ ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম আনন্দময় ধাম প্রাপ্ত হন॥ ৭২॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গৌড়ীয় গীতা।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্ম যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন।
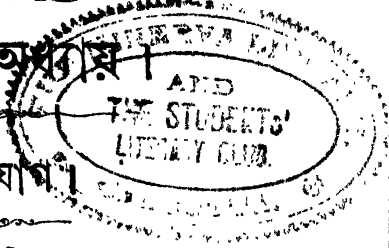
কর্ম্ম হতে শ্রেষ্ঠ মান বুদ্ধি জনার্দ্দন !
নিয়োগ কেশব ! ঘোর কর্ম্মে কি কারণ ? ১ ॥
বুদ্ধি মম মুগ্ধপ্রায় মিশ্রিত বাক্যেতে।
একে নিশ্চয়িয়া কহ শ্রেয় মম যাতে ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

লোকের দ্বিবিধ নিষ্ঠা কহিয়াছি আগে।
জ্ঞান-যোগে সাংখ্যগণ, যোগী কর্ম্ম-যোগে ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন—হে জনার্দ্দন! আপনি কর্ম্মযোগ অপেক্ষা বুদ্ধিযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতেছেন, তবে কেশব! কি জন্য আমাকে সেই ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন? ১ ॥ এক্ষণে আপনার এইরূপ মিশ্রিত বাক্যে অর্থাৎ আপনার মুখে কখন বিজ্ঞানের ও কখন কর্ম্মের প্রশংসা শুনিয়া আমার মন কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছে, অতএব হে কৃষ্ণ! যাহাতে আমার মঙ্গল হয় উভয়ের মধ্যে এমন একটী নিশ্চয় করিয়া কহুন ॥ ২ ॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে অগ্রেই কহিয়াছি ইহলোকে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের দুই প্রকার নিষ্ঠা হইয়া থাকে যথা—বিবেকী জ্ঞানিগণ জ্ঞানযোগ অবলম্বন করেন এবং জ্ঞানলাভেচ্ছুক কর্ম্ম-যোগীরা কর্ম্মযোগ আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

কর্ম্মারম্ভ বিনা নরে নৈষ্কর্ম্ম্য না পায়।
কেবল সন্ন্যাসে সিদ্ধি সম্যগ্ না হয় ॥ ৪ ॥
ক্ষণেক তিষ্ঠিতে নারে কেহ কর্ম্ম-হীনে।
প্রকৃতি টানয়ে কর্ম্মে আপনার গুণে ॥ ৫ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমিয়া মনে মনে স্মরে।
বিষয়ে যে মূঢ়, কহে মিথ্যাচারী তারে ॥ ৬ ॥
নিয়মি ইন্দ্রিয় মনে, অনাসক্তে রয়।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ে কর্ম্ম করে শ্রেষ্ঠ সেই হয় ॥ ৭ ॥
নিত্য কর কর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম হতে সিদ্ধ।
কর্ম্মবিনা দেহ যাত্রা নাহি হয় সিদ্ধ ॥ ৮ ॥

মনুষ্যগণ কর্ম্ম আরম্ভ না করিলে কর্ম্মের শেষ বা নৈকর্ম্ম্য বা নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। কেবল মাত্র সন্ন্যাসে বা কর্ম্মত্যাগে সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হওয়া যায় না—অর্থাৎ কর্ম্ম না করিলেও কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা বলবান্ থাকে, সুতরাং যতক্ষণ কর্ম্মে আসক্তি থাকে ততক্ষণ পরাসিদ্ধি লাভ হয় না ॥ ৪ ॥ হে অর্জ্জুন! কেহ কর্ম্মশূন্য হইয়া ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না, কারণ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা না করিলেও প্রকৃতি নিজ গুণে জীবগণকে অনবরত কর্ম্মে আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৫ ॥ যে ব্যক্তি বাহ্যে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সকল স্মরণ করে, সেই মূঢ় কপটাচারী বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৬ ॥ যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সকলকে মনে মনে সংযম করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভোগাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক, কেবল মাত্র শারীরিক ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা স্পৃহাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥ হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা কর্ম্ম কর। কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু কর্ম্ম ব্যতিরেকে তোমার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না—অর্থাৎ প্রমত্ত জীব নিয়ত স্পৃহা-যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে, সুতরাং তাহার জীবন ত সে আপনিই নষ্ট করিতেছে। যদ্যপি সেই জীব মুমুক্ষু অবস্থা বা বিবেক প্রাপ্ত হইয়াও স্পৃহা ও কর্ম্ম দুই একেবারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্য মুক্তির আশা করে, সে নিধন প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যদি প্রথমে স্পৃহাশূন্য হইয়া যথানিয়মে কর্ম্ম করিতে করিতে একে একে কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক যথাকালে নিষ্কর্ম্ম লাভ করত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তাহারই জীবন সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

যজ্ঞার্থে করহ কর্ম্ম নতুবা বন্ধন।
সঙ্গ ছাড়ি কর তবে কর্ম্ম-আচরণ ॥ ৯ ॥
যজ্ঞসহ সৃজি প্রজা, প্রজাপতি কন।
যজ্ঞে বাড়, যজ্ঞ সব পুরাক মনন ॥ ১০ ॥
দেবগণে বৃদ্ধি কর, তাঁহারা বাড়াবে।
পরস্পর বাড়াইয়া শ্রেয় লভ সবে ॥ ১১ ॥
যজ্ঞে বাড়ি ইষ্ট ভোগ দিবে দেব কত।
না দিয়া তদ্দত্ত ধন ভুঞ্জে চোর যত ॥ ১২ ॥
যজ্ঞ-অবশিষ্টাহারি সর্ব্ব পাপে মুক্ত।
আত্মার্থে পাকায় পাপ ভুঞ্জে পাপ-যুক্ত ॥ ১৩ ॥

হে অর্জ্জুন! অতএব তুমি যজ্ঞার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর উদ্দেশে, নিজে ফলভোগী হইব, এরূপ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্ম কর, নতুবা তুমি সঙ্কল্প করিয়া যে কর্ম্ম করিবে তাহাই তোমার জীবদ্দশায় আশাপাশ রূপ এবং জীবনান্তে পুনর্জ্জন্মরূপ বন্ধনের কারণ হইবে। অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥ হে অর্জ্জুন! প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়াই কহিয়াছেন—হে প্রাণিগণ! তোমরা যজ্ঞ দ্বারা বর্দ্ধিত হও এবং যজ্ঞই তোমাদের অভীষ্ট প্রদান করুক ॥ ১০ ॥ তোমরা সকলে দেবগণকে বর্দ্ধিত কর এবং দেবগণও তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে বৃদ্ধি করিয়া সকলেই ইষ্ট লাভ কর ॥ ১১ ॥ দেবগণ এইরূপে যজ্ঞে বর্দ্ধিত হইয়া কত ইষ্টভোগ প্রদান করিবেন। অতএব যাহারা তাঁহাদের দত্ত বস্তু সকল তাঁহাদিগকে না দিয়া ভক্ষণ করে, তাহারা চোর অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ ॥ ১২ ॥ হে অর্জ্জুন! যিনি এইরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক, দেবতাগণকে অগ্রভাগ প্রদান করিয়া, আপনি অবশিষ্ট ভোজন করেন; তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যে পাপাত্মা শুদ্ধ আপনার জন্য পাক করে, সে কেবল পাপই পাক করিয়া ভক্ষণ করে—অর্থাৎ যে ব্যক্তি দৈবে অবিশ্বাস করিয়া, কেবল মাত্র আপনার ইন্দ্রিয় সকল চরিতার্থ করিবার জন্য, ভোগ্য বস্তু সকল আহরণ পূর্ব্বক ভোগ করে, সে কেবল পাপই সঞ্চয় করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অন্ন হ'তে ভূত, অন্ন পর্জ্জন্য-সম্ভব।
যজ্ঞেতে পর্জ্জন্য, যজ্ঞ কর্ম্ম-সমুদ্ভব ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মা হতে কর্ম্ম, ব্রহ্মা অক্ষর-উদিত।
সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৫ ॥
প্রবর্ত্তিত হেন চক্র-অনুবর্ত্তী নয়।
অঘায়ু, ইন্দ্রিয়ারামী, বৃথা বেঁচে রয় ॥ ১৬ ॥
যে মানব আত্ম-রত, আত্ম-তৃপ্ত আর।
আত্মাতেই তুষ্ট যেই, কার্য্য নাহি তার ॥ ১৭ ॥
কৃতে অর্থ, অকৃতে বা অনর্থ না হয়।
সর্ব্বভূতে কোন অর্থে আশ্রয় না লয় ॥ ১৮ ॥

হে অর্জ্জুন!—ভূতগণ অন্ন হইতে, অন্ন বৃষ্টি বা শিশির হইতে, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে ॥ ১৪ ॥ কর্ম্ম ব্রহ্মা হইতে এবং ব্রহ্মা অক্ষয় পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন; অতএব সকলের অন্তর্গত ব্রহ্মই এইরূপে সর্ব্ব যজ্ঞে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৫ ॥ হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি এইরূপে উত্তরোত্তর-বর্দ্ধন-কারী কর্ম্ম চক্রের অনুবর্ত্তী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়-আরাম-কারী পাপাত্মার জীবনই বৃথা ॥ ১৬ ॥ হে অর্জ্জুন! যিনি আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই তুষ্ট, তাঁহার জগতে কোন কর্ম্মই নাই—তিনি জীবন্মুক্ত ॥ ১৭ ॥ অতএব তিনি লোকাচারে কর্ম্ম করিলেও কর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং সে কর্ম্মে তাঁহার কোন ইষ্ট নাই এবং কর্ম্ম না করিলেও, কর্ম্মে আসক্তি না থাকায়, তাহাতে তাঁহার কোন অনিষ্টও নাই। অর্থাৎ স্পৃহাশূন্যতা হেতু, তিনি কর্ম্ম করিলে তাঁহার স্থূল শরীর কর্ম্মযুক্ত, কিন্তু লিঙ্গ শরীর নির্লিপ্ত থাকে এবং কর্ম্ম না করিলে স্থূল ও লিঙ্গ শরীর দুইই নির্লিপ্ত থাকে; অতএব তাঁহার মনোময় কোষাদিযুক্ত সূক্ষ্ম শরীর উভয় অবস্থাতেই একরূপ নির্লিপ্তভাবে, অবস্থান করে সুতরাং তাঁহাকে শান্তির নিমিত্ত কাহারও কাছে কোন বিষয়ের জন্য আশ্রয় লইতে হয় না ॥ ১৮ ॥

আসক্তি ছাড়িয়া তবে কর্ম্ম সদা কর।
অনাসক্তে করি কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় পর ॥ ১৯ ॥

কর্ম্মগুণে জনকাদি সকলেই সিদ্ধ।
লোক-ধর্ম্ম-রক্ষা-হেতু কর্ম্মই প্রসিদ্ধ ॥ ২০ ॥

মহতের দেখি শিখে ইতরে আচার।
মহত-প্রমাণ লোক অনুগামী আর ॥ ২১ ॥

ত্রিলোকে কর্ত্তব্য মোর কিছু নাহি হয়।
অপ্রাপ্ত, কি প্রাপ্য, তবু কর্ম্ম মোর রয় ॥ ২২ ॥

তন্দ্রা-হীন হয়ে কর্ম্ম নাহি করি তবে।
মম-পথ-অনুগামী সর্ব্ব নর হবে ॥ ২৩ ॥

আমি না করিলে কর্ম্ম লোকোৎসন্ন যায়।
সঙ্করের কর্ত্তা হয়ে হানিব প্রজায় ? ২৪ ॥

অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৯ ॥ জনকাদি ঋষিগণ এইরূপে আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়াছিলেন। অতএব হে অর্জ্জুন! জনসাধারণের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ২০ ॥ কারণ মহতের দেখিয়া ইতর সাধারণে আচার শিক্ষা করে এবং সকলে মহাজনেরই পথ অবলম্বন করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥ হে অর্জ্জুন! ত্রিলোকে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, আমার অপ্রাপ্ত কিছুই নাই এবং আমার প্রাপ্যও কিছুই নাই; তথাপি আমি লীলাছলে কর্ম্ম করিতেছি ॥ ২২ ॥ হে অর্জ্জুন! আমি যদি তন্দ্রাহীন হইয়া কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে সমস্ত লোক আমারই পথ অনুসরণ করিবে ॥ ২৩ ॥ এবং এইরূপে আমি কর্ম্ম না করিলে লোক সকল উৎসন্ন যাইবে, সুতরাং আমি বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইয়া কি প্রকারে আপনিই আপনার প্রজা সকলকে নষ্ট করিব ? ২৪ ॥

স্পৃহা-যুক্তে করে কর্ম্ম যেমতি অজ্ঞানী।
লোক-ধর্ম্ম-রক্ষা-হেতু স্পৃহা-হীনে জ্ঞানী ॥ ২৫ ॥
কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর বুদ্ধি না ঘাঁটায়ে।
যুক্তাচারী জ্ঞানী সর্ব্ব কর্ম্মেতে যোগয়ে ॥ ২৬ ॥
ক্রিয়মাণ কর্ম্ম যত প্রকৃতির গুণে।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা আমি কর্ত্তা মানে ॥ ২৭ ॥
গুণ কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ববিদ্ জন।
গুণী গুণে রহে জানি, মাতায় না মন ॥ ২৮ ॥
প্রকৃতিজ-গুণ-মূঢ় গুণ কর্ম্মে ভোলে।
হেন মন্দ অবিজ্ঞকে সর্ব্বজ্ঞ না চালে ॥ ২৯ ॥

হে অর্জ্জুন! অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ যেরূপ স্পৃহাযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করে, জ্ঞানি-গণ সেইরূপ স্পৃহাশূন্য হইয়া লোক সকলকে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥ একনিষ্ঠ জ্ঞানিগণ কামনাপরায়ণ মূঢ় ব্যক্তিগণের সহিত কোন তত্ত্বে বাদানুবাদ না করিয়া—অর্থাৎ তাহাদের বুদ্ধি না ঘাঁটাইয়া সকল কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥ হে অর্জ্জুন! ক্রিয়মাণ কার্য্যমাত্রই স্বভাবত উৎপন্ন হইয়া থাকে—অর্থাৎ কেহ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করুক বা না করুক প্রকৃতি নিজ প্রয়োজন বশত প্রাকৃতিক পদার্থ সকলকে কর্ম্মে আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু যাহার চিত্ত অহঙ্কারে হতজ্ঞান হইয়াছে, সেই মূর্খ আপনাকেই কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ যাঁহারা গুণ ও কর্ম্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ঘণ্ট করিয়া তাহাদের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন—গুণময় পদার্থ সকল গুণ আকর্ষণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ভৌতিক ইন্দ্রিয় সকলের বাহ্য ভূতের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, তাহারা স্ব স্ব সম্বন্ধানুরূপ বিষয় সকল গ্রহণ বর্জ্জনাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু নির্গুণ আত্মার কোন কর্ম্ম নাই—এই স্থির করিয়া, তাঁহারা প্রমত্ত হন না ॥ ২৮ ॥ প্রকৃতিজাত-গুণ-মুগ্ধ ব্যক্তিগণ নিয়ত গুণ ও কর্ম্মে মগ্ন হইয়া থাকে, সুতরাং—'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'—এই ভাবিয়া জ্ঞানিগণ সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিদিগকে কখন বিচলিত করেন না ॥ ২৯ ॥

সর্ব্ব কর্ম্ম মোতে অর্পি, অধ্যাত্ম চেতনে।
নিরাশে, নির্ম্মমে উঠ শোক ছাড়ি রণে ॥ ৩০ ॥
হেন মম মতে নিত্য যে মানব রয়।
শ্রদ্ধাবান্ অনসূয় কর্ম্মে মুক্ত হয় ॥ ৩১ ॥
মম মতে নাহি রয়, অসূয়া-অধীন।
সর্ব্ব-জ্ঞান-মূঢ়, নষ্ট, সেই চিতহীন ॥ ৩২ ॥
প্রকৃতি সদৃশ কর্ম্ম করে জ্ঞানবানে।
প্রকৃত্যনুগত ভূত নিগ্রহ কেমনে ? ৩৩ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থে ইন্দ্রিয়ের রাগ দ্বেষ রহে।
না হও দোঁহার বশ, মোক্ষ-বৈরী দোঁহে ॥ ৩৪ ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি মদেক-চিত্তে সকল কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, আশা, মমতা ও শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩০ ॥ হে অর্জ্জুন! এক্ষণে যে রূপ কহিলাম সেইরূপ নির্লিপ্ত ভাবে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও অসূয়া বিহীন হইয়া অবস্থান করেন, তিনি সকল প্রকার কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥ ৩১ ॥ আর যে ব্যক্তি অসূয়া-পরবশ হইয়া ইহার বিপরীত আচরণ করে, সেই সর্ব্ব জ্ঞানে অজ্ঞ, বুদ্ধিবিহীন ব্যক্তি নিশ্চয়ই নষ্ট হয় অর্থাৎ তাহার আর উদ্ধার নাই ॥ ৩২ ॥ হে অর্জ্জুন! জ্ঞানবান্ লোকে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কারণ ভূত সকল যখন প্রকৃতির অনুগত, তখন কে তাহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে ? ৩৩ ॥ হে অর্জ্জুন! যেমন চক্ষু কোন রূপ দেখিতে ভাল-বাসে, আর কোন রূপ দেখিতে অনিচ্ছু, কর্ণ কোন রব শুনিতে রত, কোন রব শুনিতে বা বিরত হয়, সেইরূপ সকল ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব সম্বন্ধীয় বিষয়ে আসক্তি বা বিদ্বেষ থাকে। অতএব তুমি ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইও না। কারণ ইন্দ্রিয়গণ ক্রমাগত ভোগ প্রার্থনা করিতেছে এবং বিষয়সকল সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছে ; এই প্রকারে জীবগণ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া নিয়তই কর্ম্মজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছে। অতএব ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ দুইই মোক্ষের প্রতিবন্ধক ॥ ৩৪ ॥

পূর্ণ-পরধর্ম্ম-শ্রেয় বিগুণ স্বধর্ম্ম।
স্বধর্ম্মে নিধন ভাল, ঘোর পর ধর্ম্ম ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন।

কাহার প্রযুক্ত, পাপ পুরুষ আচরে?
অনিচ্ছায় বলে কৃষ্ণ! নিয়োজিত করে? ৩৬ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

রজো গুণ হতে কাম ক্রোধের উদয়।
মহাশন, মহাউগ্র, মোক্ষ-বৈরী হয় ॥ ৩৭ ॥
ধূমে বহ্নি যথাবৃত, মলেতে দর্পণ।
উল্বাবৃত গর্ভ, হেন কামেতে চেতন ॥ ৩৮ ॥

হে অর্জ্জুন! পরধর্ম্মের পূর্ণ বা সর্ব্বাঙ্গীন অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা স্বধর্ম্মের কথঞ্চিৎ বা অঙ্গহীন আচরণও শ্রেয়। এমন কি, স্বধর্ম্মে মরণও ভাল, কারণ পর ধর্ম্মে কেবল ভয় মাত্র সার—অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে রূপ ধর্ম্মের অধিকারী বা সম্যগ্ অনুষ্ঠানে পারদর্শী, সে সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যদি নিধনও প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহার সাধনা নিষ্ফল হয় না। যেহেতু সে জন্মান্তরে পূর্ব্ব সংস্কার বশত উত্তম বংশে জন্মলাভ করিয়া পুনরায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি যে ধর্ম্মের অধিকারী নয়, সে যদি সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহার মানসক্ষেত্র তদনুরূপ প্রস্তুত না থাকায়, সে সেই ধর্ম্মবীজ ধারণ বা পালন করিতে অসমর্থ হয়,—সুতরাং বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে—অনধিকার সাধনে উৎকণ্ঠা ও পীড়া মাত্র সার হয় ॥ ৩৫ ॥ অর্জ্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ! মনুষ্যগণ কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়? এবং ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক পাপে নিযুক্ত করে? ৩৬ ॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অর্জ্জুন! রজোগুণ হইতে কাম ও পরে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং সেই সর্ব্বগ্রাসী কাম ও মহাপ্রচণ্ড ক্রোধই মোক্ষের প্রতিবন্ধক ॥ ৩৭ ॥ হে অর্জ্জুন! যেরূপ ধূমদ্বারা অগ্নি, মলদ্বারা দর্পণ, এবং চর্ম্মদ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কামদ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে ॥ ৩৮ ॥

আবৃত কামেতে হেন জ্ঞানীর গেয়ান।
নিত্যবৈরী, দুঃখপূর, অনল-প্রমাণ ॥ ৩৯ ॥
ইন্দ্রিয়, মানস, বুদ্ধি কামনার স্থান।
আবরিয়া জ্ঞান, করে দেহীরে অজ্ঞান ॥ ৪০ ॥
সংযমি ইন্দ্রিয় আগে বিনাশ হে! পরে।
গেয়ান-বিজ্ঞান-নাশী এ হেন পাপেরে ॥ ৪১ ॥
ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

জ্ঞানিগণের জ্ঞানও এইরূপ চিরশত্রু অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভুক্ কাম দ্বারা আবৃত থাকে ॥ ৩৯ ॥ হে অর্জ্জুন! ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারাই কামনার আবির্ভাব-স্থান, সেই কামনাই জ্ঞানকে আবরণ করিয়া দেহীকে অজ্ঞান করিয়া রাখে ॥ ৪০ ॥ অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়সকলকে সংযম করিয়া, পরে জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিনাশক দুর্ব্বৃত্ত কামনাকে বিনাশ কর—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল যখন কামনার দুর্গস্বরূপ, তখন দুর্গ জয় না করিলে দুর্গস্থ শত্রুকে বিনাশ করা অসাধ্য, অতএব অগ্রে দুর্গ জয় কর পরে দুর্গস্থ শত্রু কামকে জয় করিও ॥ ৪১ ॥ হে অর্জ্জুন! দেহ হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই জ্ঞানরূপী পরব্রহ্ম—অর্থাৎ এই মাংসাস্থি-মজ্জাদি-নির্ম্মিত ভোগমন্দিররূপ শরীরের মধ্যে, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ই প্রধান, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। পুনশ্চ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাও দেখা যাইতেছে। আবার সুস্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, উক্ত দশ ইন্দ্রিয় কদাচ স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিতে পারে না। ইচ্ছাময় কোন পদার্থ ইচ্ছা না করিলে, পদাদি উঠিতে পারে না, এবং চক্ষুরাদিও বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। নিরাকার ইচ্ছাময় কোন পদার্থ দেহের মধ্যে বসিয়া ইন্দ্রিয়গণকে চালাইতেছে—কেবলই ইচ্ছা করিতেছে—ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে—উঠিতেছে, পড়িতেছে

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

—ভাসিতেছে, ডুবিতেছে এবং হাঁসিতেছে ও কাঁদিতেছে। তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না এবং ইন্দ্রিয়গণও তাহার পরিচয় দিতে পারে না—এমন শূন্যময় পদার্থকে ঋষিরা মন সংজ্ঞা দিয়াছেন। এই মনের অস্তিত্ব কেবল মাত্র জ্ঞানে অনুভব করা যায়—অতএব মনঃজ্ঞানই মন, মনঃশব্দ বা বাক্য মন নহে; সুতরাং মন—বাক্যের এবং কর্ণের ও অতীত। যেরূপ শূন্য হইতে পঞ্চভূতাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ কামনা পূর্ণ মন হইতেই এই পঞ্চইন্দ্রিয়শালী ব্রহ্মাণ্ড সংজ্ঞিত দেহজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং শূন্যের সহিত—কর্ণের ও বাক্যের, বায়ুর সহিত—ত্বকের ও পাণির, অগ্নির সহিত—চক্ষুর ও পদের, জলের সহিত—জিহ্বার ও পায়ুর এবং পৃথিবীর সহিত—নাসিকার ও উপস্থের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভূতগণ গুণ আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইহেতু শূন্যে, কর্ণে ও বাক্যে—ধ্বনি; বায়ুতে, ত্বকে ও হস্তে—স্পর্শ; আগ্নিতে, চক্ষুতে ও পদে—রূপ; জলে, জিহ্বায় ও পায়ুতে—রস; এবং পৃথিবীতে, নাসিকায় ও উপস্থে—গন্ধগুণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। যেরূপ ভৌতিক জগতের অভ্যন্তরে গুণময় জগৎ রহিরাছে; তদ্রূপ এই ভৌতিক দেহে গুণময় বা বাসনাময় মানস জগৎ, পঞ্চগুণরূপ পঞ্চইন্দ্রিয়গণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। যেরূপ বাহ্য জগতীয় পদার্থের গুণই সর্ব্বস্ব এবং ভৌতিক রূপ কোন কার্য্যকারক নহে—কারণ যেমন কোন একটী ফল দেখিতে আম্রের মত হইলে যদি তাহাতে আম্রের ন্যায় স্বাদ না থাকিয়া যামের ন্যায় আস্বাদ থাকে, লোকে তাহাকে আম্র না কহিয়া এক-জাতীয় যামই কহিয়া থাকে—সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণের আস্বাদ—সুতরাং ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কোন সময়ে অন্যমনস্ক থাকিলে—কর্ণকুহরে শব্দ প্রবিষ্ট হইলেও, কর্ণ সেই শব্দ গ্রহণ করিতে পারে না—কোন বস্তু চক্ষে পড়িলেও, চক্ষু যেন দেখিতে পায় না—তাহার কারণ মন ইন্দ্রিয়গণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্তমনে কি চিন্তা করিতেছে। যেরূপ হলবর্ণ স্বরের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত না হইলেও, স্বরবর্ণ বিনা সাহায্যে আপনিই উচ্চারিত হয়, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত—অর্থাৎ কর্ণ মুদিয়া শ্রবণ, চক্ষু মুদিয়া

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

দর্শন, স্পর্শন ব্যতীত স্পর্শ লাভ—ইত্যাদিরূপে বিষয় গ্রহণ করিতে পারে। বলিতে কি, ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে—যেমন হাট করিবার পূর্ব্বে, মনে-মনেই পাককার্য্য এবং আহারও নিষ্পন্ন হইয়া যায়—বিষয়সকল সেইরূপে মনেই নির্ম্মিত হইয়া, প্রথমত শূন্যময় গুণাকার, এবং পরে ভৌতিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব মনই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মনের ব্যাপার বা মনন কাণ্ড, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বা কর্ম্মকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ কি? পুনশ্চ প্রতীয়মান হইতেছে, প্রবৃত্তিময় মনের কতকগুলি বৃত্তি বা স্মৃতি-ধৃতি-রূপ শক্তি আছে। যেমন বাহ্যজগতে কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তিদ্বারাই ভৌতিক পরমাণুসকল পরস্পর পরস্পরে সংযুক্ত এবং বিযুক্ত হইতেছে; সেইরূপ ধীশক্তি বলে, মনে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে। সেই বুদ্ধিশক্তি বা বিবেক বা বিজ্ঞান, মন হইতে যে স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে। সুকুমারমতি শিশুর ইন্দ্রিয়াদির সহিত মন বিকসিত হইয়াছে। সে ইন্দ্রিয় চালনা করিতে এবং মনে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিতে পারে—অর্থাৎ সে কেবল খাইতে পারে, কাঁদিতে পারে, হাঁসিতে পারে, খেলিতে পারে এবং ঘুমাইতে পারে, অথবা আহার নিদ্রা এবং ক্রীড়াই জানে; কিন্তু ভূতভবিষ্যৎ চিন্তা বা হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে না, সুতরাং তাহার পুণ্যপাপ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম কিছুই জ্ঞান থাকে না। তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তখনও তাহার বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময়কোষ প্রস্ফুটিত হয় নাই। অতএব মন হইতে বুদ্ধি স্বতন্ত্র শক্তি এবং শ্রেষ্ঠ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনুশীলন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সূক্ষ্মই স্ফীত হইয়া স্থূলাকার ধারণ করিতেছে—নিরাকারই সাকার রূপে পরিণত হয়। আবার স্থূলই সূক্ষ্ম—সাকারই নিরাকার হইয়া যায়। নিরাকার শূন্য স্ফীত হইয়া বায়ু, বায়ু স্ফীত হইয়া অগ্নি, অগ্নি স্ফীত হইয়া জল, জল স্ফীত হইয়া পৃথিবী এবং পৃথিবী ক্ষুভিত হইয়া নানা বর্ণাদি বিভূষিত চেতন অচেতনাদি পদার্থ সকল উৎপন্ন করিয়াছে। পুনশ্চ পৃথিবী শীর্ণা

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

হইয়া জলে মগ্ন বা লীন হইতেছে, জল বাষ্পাকারে অগ্নিতে যক্ত হইতেছে, অগ্নি ধূমাকারে বায়ুমধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং বায়ু শূন্যাকারে শূন্যে মিশিতেছে—এইরূপে ভূতগণ নিয়ত ক্রিয়মাণ হইতেছে। অতএব শূন্যই—এই ভৌতিক জগৎ, এবং ভৌতিক জগৎই—শূন্য, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সূক্ষ্ম বীজ মধ্যে যখন শাখা-প্রশাখাদি-সমাকুল প্রকাণ্ড বৃক্ষই সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতেছ—অর্থাৎ মৃত্তিকা মধ্যে বীজ স্থাপিত হইবা মাত্রই, সেই বীজ শক্তি প্রভাবে মৃত্তিকা রস আকর্ষণ করিতে করিতে ক্রমশ অঙ্কুরিত হয় এবং কালক্রমে সেই বীজই শাখা প্রশাখাদি বিস্তার করত প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়; বীজের সূক্ষ্ম অঙ্গগুলির ভিতরে মৃত্তিকারস প্রবেশ করত সেই সূক্ষ্মগুলিকেই স্থূল বা বৃহৎ করিয়া তুলে, অতএব যখন নূতন কিছুই হইতেছে না, যাহা সঙ্কুচিত ভাবে ছিল, তাহাই বিস্তারিত হইতেছে, ইহা চক্ষের উপরে ঘটিতেছে,—তখন সেই সূক্ষ্ম নিরাকার শক্তিই যে এই জগতের প্রবর্ত্তক তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সেই শক্তি বা প্রকৃতি মনেরও অগোচর, কেবল মাত্র জ্ঞানে তাহার অস্তিত্ব বা উপলব্ধি দৃষ্ট হয়। আবার যেরূপ বীজ বলিতে শস্যত্বকাদি কতকগুলি কোষ স্তরে স্তরে স্থাপিত কোন স্বনাম বিখ্যাত পদার্থ বই আর কিছুই নয়, এবং বাহ্য জগৎ বলিতে শূন্যাদি ভূতাবৃত—অর্থাৎ বাহ্য জগতের প্রথম আবরণ শূন্য, শূন্যের পর বায়ুর স্তর, বায়ুর পর জ্যোতির্ম্ময় আবরণ বা অগ্নি বা আলোক, অগ্নির পর জলাবরণ এবং জলের পর পৃথিব্যাবরণ, এবং পৃথিবীই এই স্থাবর জঙ্গমাদির আবরণ এইরূপ—এক মণ্ডলমাত্র; সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞিত দেহ পঞ্চ কোষাবৃত একটী ভোগমন্দির মাত্র। প্রথমত অস্থি-মাংসাদি নির্ম্মিত অন্নজাত শরীর। বীজ যেরূপ মৃত্তিকার সংযোগে আপন আয়তন পুষ্টি করে, মহাশুক্রও সেইরূপ মহাশোণিত আশ্রয়ে আয়তন বৃদ্ধি করে। যেহেতু শোণিত অন্ন হইতে উৎপন্ন, এ কারণ ঋষিরা ইহাকে অন্নময়-কোষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই অন্নময়কোষ বা স্থূলশরীর

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

পৃথিবীজাত যাবতীয় পদার্থের, এবং পৃথিবী জল ও অগ্নি এই তিন মহাভূতের সারসমষ্টিমাত্র, সুতরাং রূপ রস ও গন্ধ এই তিন গুণ-বিশিষ্ট। অতএব এই অন্নময় জগতে—বৃক্ষ, লতা, নদ, নদী, ভূধর, সাগর, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি সমস্তই সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান। জগতে যে জাতির যে শ্রেষ্ঠ, সেই জাতির সে সারসমষ্টি বা সূক্ষ্মবীজ। অতএব এই অন্নজাত দেহে, ভূ-জগতের শ্রেষ্ঠ—ভূধর, জল-জগতের সার—সাগর, এবং সৌর-জগতের রাজা—চন্দ্র সূর্য্যাদি প্রত্যক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। মেরুদণ্ডরূপী সুমেরু গিরি পৃষ্ঠদেশে অচল-প্রতিষ্ঠিত রূপে অবস্থান করিতেছে। এই কৈলাস-শিখরে বা ব্রহ্ম-রন্ধ্রে, সহস্রদল পদ্মাকার শক্তিমণ্ডল মধ্যে অষ্টকলাযুক্ত অষ্টৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ চন্দ্রদেব বিরাজ করিতেছেন। এই চন্দ্রসুধা বা জ্ঞানধারা অবিরল দুই মুখে প্রবাহিত হইতেছে। একদিক হইতে তিনটী নাড়ী তিন প্রবাহিণী রূপে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে বহির্গত হইয়া মেরুকেই আশ্রয় পূর্ব্বক মেরুমূলে আসিয়া মিশিয়াছে। বামে পুণ্য-সলীলা রজোময়ী গঙ্গারূপী ইড়া,—এই ইড়ামার্গ দিয়াই সুধাধারা নামিতেছে—দক্ষিণে তমোময়ী কালিন্দিরূপী পিঙ্গলা, এবং মধ্যে সত্ত্বময়ী সরস্বতীরূপী সুসুম্না। মেরুশিখরের অপর দিক হইতে কেবল সুসুম্না বাহির হইয়া জ্ঞান-ধারা বহন করত চক্রে চক্রে, সম্মুখ দেশ দিয়া নামিয়াছে। সুমেরু-আশ্রিত তিন প্রবাহিণী মেরুমূলে একত্রিত হইয়া ত্রিবেণী সঙ্গম উৎপন্ন করিয়াছে। লিঙ্গমূল ও গুহ্যদেশ এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মেরুদণ্ডের মূল। যেমন পর্ব্বতমূল হইতে প্রবাহিণীগণ প্রবাহিত হইয়া, কত নগর নগরীকে ধৌত করত—কতশত জীবগণকে জীবনদান করত, কেহ অন্য প্রবাহে আর কেহ বা মহাজলে নিপতিত হইতেছে; সেইরূপ মেরুমূল হইতে প্রবাহিণী শিরা বা নাড়ীগণ নির্গত হইয়া, কেহবা অন্য নাড়ীতে, আর কেহবা শরীরের শেষভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া বাহির জলে বা মহাসমুদ্রে মিশি-

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

য়াছে। যে ত্রিধারা মেরুশিখর হইতে ঝরণারূপে নামিয়াছে, সেই ত্রিধারা পুনশ্চ মুখ্যনাড়ীরূপে এই মেরুমূল হইতে মধ্যে মধ্যে জড়িত হইয়া, ষট্‌স্থানে ষট্‌চক্রাকার ধারণপূর্ব্বক, মহাশক্তির আধার হওত, ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া, ভ্রূমধ্যে শেষচক্রে সুসুম্নাকে বেষ্টন করত, ইড়া বাম নাসাবিবিরে পিঙ্গলা দক্ষিণ নাসাবিবরে, আসিয়া মহাসমুদ্রে লীন হইয়াছে এবং সুসুম্না একাকী ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠিয়াছে। মহাসমুদ্রের জল যেরূপ জুয়ারে নদী মধ্যে প্রবেশ করে এবং ভাঁটায় চলিয়া যায়, সেইরূপ মহাভৌতিক বায়ু, আকর্ষণে নাসাবিবর দিয়া ইড়াপিঙ্গলামধ্যে নিশ্বাসরূপে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং প্রশ্বাসরূপে বহির্গত হইতেছে। মেরুর মূল, শঙ্খের আবর্ত্তের ন্যায় মুখ গুটাইয়া, কুণ্ডলিনীশক্তি প্রভাবে সুসুম্নার রন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। যোগিগণ প্রাণায়াম দ্বারা এই কুণ্ডলিনী শক্তিকেই জাগরিত করিয়া, সুসুম্নার রন্ধ্র মুক্ত করত, সেই সুসুম্না-দ্বারা-ব্রহ্ম-রন্ধ্র-নিপতিত অমৃতধারা পান করিতে করিতে, ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। এই মূলাধারেই ইড়া-পিঙ্গলা-সুসুম্না-নির্ম্মিত প্রথম চক্র বা অগ্নি জল মৃত্তিকার প্রথম মণ্ডল বা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর প্রথম মহাদ্বীপ—ইহার নাম মূলাধারচক্র। লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক চক্র বা দ্বিতীয় ভূমণ্ডল। নাভিমূলে মণিপুর নামক চক্র বা তৃতীয় ভূমণ্ডল। হৃদয়ে অনাহতচক্র বা চতুর্থ ভূমণ্ডল। কণ্ঠে বিশুদ্ধচক্র বা পঞ্চম ভূমণ্ডল। ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাপুরচক্র বা ষষ্ঠ ভূমণ্ডল এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে সুসুম্না নির্ম্মিত সূক্ষ্ম সর্পফণার ন্যায় সুদর্শন চক্র বা সপ্তম ভূমণ্ডল। পুনশ্চ দেখা যাইতেছে, এই অন্নময় যন্ত্র অন্তঃশূন্য, এবং সেই শূন্যস্থান বায়ু অধিকার করত, নিয়ত সঞ্চারণে শোণিতাদিকে ক্রিয়মাণ করিতেছে। এই বায়ুই দেহের প্রাণ, কারণ শ্বাস প্রশ্বাস বলেই দেহ চলিতেছে। এই জন্য ঋষিরা ইহাকে প্রাণময়কোষ নামে সংজ্ঞিত করিয়াছেন। এই কোষ বায়ুরূপ মহাভূতের সারসমষ্টি মাত্র, সুতরাং বায়বীয় পদার্থ মাত্রই সূক্ষ্মরূপে প্রাণময়কোষে

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

বিরাজিত রহিয়াছে। নিশ্বাসপ্রশ্বাসই জীবন এবং শ্বাসশূন্যতাই মরণ বা শ্বাসরোধই পরম নির্ব্বাণ,—অর্থাৎ ক্ষীতি জল ও অগ্নিনির্ম্মিত গুটীমধ্যে, বায়ুময় গুটিপোকা বায়ু আকর্ষণ করত অবস্থান করিলেই প্রাণধারণ, আর সেই বায়ুময় সুতরাং অদৃশ্য গুটীপোকা গুটী ফেলিয়া অপর স্থানে চলিয়া গেলেই প্রাণত্যাগ। অতএব বায়ুই প্রাণ। এই প্রাণ বায়ুই শরীরের পঞ্চস্থানে থাকিয়া আকর্ষণাদি পঞ্চ শক্তির বা অন্তঃস্থ কর্ম্ম—এবং উদ্গারউন্মীলনাদি পঞ্চ বহিস্থ কার্য্য করিতেছে। হৃদয়ে প্রাণবায়ু অবকাশরূপ অন্তঃস্থ, এবং নাগ বায়ু উদ্গাররূপ বহিস্থ কর্ম্ম করিতেছে। গুহ্যদেশে অপান বায়ু অন্তরে শোধন এবং কূর্ম্মবায় বাহিরে ক্ষুধা কার্য্য করিতেছে। নাভিমণ্ডলে সমানবায়ু অন্তরে দহন, এবং কৃকরবায়ু বাহিরে তৃষ্ণা কার্য্য করিতেছে। কণ্ঠদেশে উদানবায়ু অন্তরে ক্লেদন, এবং দেবদত্তবায়ু বাহিরে জৃম্ভন কার্য্য করিতেছে। সর্ব্বশরীরে ব্যান বায়ু অন্তরে ধারণ এবং বাহিরে ধনঞ্জয় বায়ু হিক্কা কার্য্য করিতেছে। এই সমুদয় প্রকার বায়ুর মিলিত নাম প্রাণময় কোষ। বায়ুতে যত প্রকার স্বরবীজ এবং নামবীজ আছে এই দেহে চক্রস্থিত পদ্মাকার বায়ুমণ্ডলমধ্যে তৎ সমস্তই আছে। স্বর সাধন কালে স্বর ত্যাগ করিলেই, শ্বাস বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল বায়ু পদ্মে আঘাত করে। এইরূপে স্বরাঘাতে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ষড়জনামক প্রথম স্বর উত্থিত হয়। এই স্বর ওঁকারের রেস মাত্র। মুখব্যাদান করিয়া স্বর নির্গত করিলেই প্রথমে অ—অ—অ এইরূপ স্বর উঠিয়া থাকে। পরে মুখ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিলে উ—উ—উ এইরূপ স্বর উঠিয়া থাকে। অবশেষে মুখ সম্পূর্ণ কুঞ্চিত করিয়া স্বর নিঃসারণ করিলে ম—ম্—ম্ এই-রূপ স্বরে স্বর লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং অ আদিস্বর, উ মধ্যস্বর এবং ম্ অন্ত্যস্বর। যেরূপ উৎপত্তি,বৃদ্ধি,পতন লইয়াই ভৌতিক জগৎ সেইরূপ তারা, মুদারা উদারা বা অ, উ, ম্ লইয়াই স্বরগ্রাম। স্বরই নাম—এবং নামই জগৎ—সুতরাং নামই ধর্ম্মের ভিত্তি। এক আছেন—এই নামই মুমুক্ষু

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

হৃদয়াকাশে প্রথমে উদিত হয়। পরে মুমুক্ষু জীব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সেই নামেরই বিচারে প্রবৃত্ত থাকিয়া পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করে। অবশেষে মুমুক্ষু জীব সমাধি প্রাপ্ত হইয়া সেই নামেরই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে। অতএব নামই সর্ব্বস্ব। ওঁকারই এই নামের আদিবীজ। কারণ ইহা অ, উ, ম্ এই ত্রিঅক্ষরের সার-সমষ্টি; সুতরাং স্বরগ্রামের সৃষ্টি স্থিতি লয় এক মাত্র ওঁকারেই হইতেছে। ওঁকারই সর্ব্ব যজ্ঞের আদি বা বীজমন্ত্র। একমাত্র ওঁকার সাধনেই ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ওঁকার ব্রহ্মরন্ধ্রে বিরাজমান। এইরূপে স্বর কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিলে, সেই স্বর ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে প্রবাহিত হইয়া ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাপুরচক্রে অবতরণ করে। এই আজ্ঞা-পুরচক্র মধ্যে দ্বিদলপদ্মাকার নাদমণ্ডল সর্ব্বদা ঘূর্ণমান রহিয়াছে। যেমন শূন্যে আঘাত করিলে, মহানাদরূপী শূন্য হইতে প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়, সেইরূপ স্বর আজ্ঞাপুরস্থ নাদমণ্ডলে আঘাত করিলে ঋষভ-স্বর উৎপন্ন হয়। এইরূপে বাক্যকথন বা নামোচ্চারণকালে বায়ু পুরণ করত সেই বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে তুলিলে ওঁকার এবং এই দ্বিদল আজ্ঞাপুর পদ্মে রাখিলে দুই দল হইতে হ ক্ষ এই দুইটী অক্ষর উচ্চা-রিত হয়। এইরূপে স্বর আরও কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিলে কণ্ঠে বিশুদ্ধ চক্রে আসিয়া অবস্থান করে। এই বিশুদ্ধ চক্রে ষোড়শদলযুক্ত পদ্মাকার এক বায়ুমণ্ডল ঘুরিতেছে। এই বায়ুমণ্ডলে স্বর আঘাত করিলে স্বরগ্রাম হইতে গান্ধারস্বর এবং ষোড়শদল বর্ণগ্রাম হইতে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোলটী স্বরবর্ণ উচ্চা-রিত হয়। পরে স্বর আরও উঠাইলে হৃদয়ে অনাহত চক্রে উপস্থিত হয়। এই অনাহত চক্রে দ্বাদশদল বিশিষ্ট পদ্মের ন্যায় এক নাদমণ্ডল অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে। স্বরাঘাতে তাহার মধ্যস্থ বা স্বর গ্রাম হইতে মধ্যমস্বর এবং তাহার দ্বাদশদল বর্ণগ্রাম হইতে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই দ্বাদশটী বর্ণ উচ্চারিত হয়। পুনশ্চ স্বর বা শ্বাসবায়ু

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন॥ ৪২॥

প্রবাহিত হইয়া নাভিমূলে মণিপূরচক্রে উপস্থিত হয়। এই চক্রে দশদলযুক্ত এক নাদপদ্ম নিয়ত ঘূর্ণায়মান। শ্বাসবায়ু সেই পদ্মমধ্যে আঘাত করিলে ইহার স্বরগ্রাম হইতে পঞ্চমস্বর এবং দশদল বর্ণগ্রাম হইতে ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই দশ বর্ণ উচ্চারিত হয়। অতঃপর শ্বাসবায়ু আরও কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিলে, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপস্থিত হয়। এই চক্রমধ্যে ছয় দলবিশিষ্ট পদ্মের ন্যায় এক নাদমণ্ডল ঘুরিতেছে। শ্বাসবায়ু এই পদ্মে আঘাত করিলে ইহার স্বরগ্রাম হইতে ধৈবত স্বর এবং ষড়দল বর্ণগ্রাম হইতে ব ভ ম য র ল এই ছয়টী অক্ষর উচ্চারিত হয়। অবশেষে শ্বাসবায়ু প্রবাহিত হইয়া মূলাধার চক্রে উপস্থিত হয়। এই মূলাধার চক্রে চতুর্দ্দল পদ্মাকার এক নাদমণ্ডল ঘুরিতেছে। স্বর সেই নাদমণ্ডলে আঘাত করিলে তন্মধ্যস্থ স্বরগ্রাম হইতে নিষাদস্বর এবং চতুর্দ্দল বর্ণগ্রাম হইতে ব শ ষ স এই চারিটা অক্ষর উচ্চারিত হয়। এই সপ্ত স্বর ও পঞ্চাশৎ বর্ণ ব্যতীত শূন্য ও বায়ু মধ্যে স্বর বা বর্ণই নাই। এতদ্ভিন্ন যাহা কিছু শুনা যায় তৎ সমুদয়ই ইহাদিগের—লঘু, গুরু অর্থাৎ—হ্রস্ব, দীর্ঘ—ইত্যাদি অনুসারে মাত্রাভেদ মাত্র। এই মূলাধারচক্রে বায়ুমণ্ডলের উপরে দ্বাদশ কলাযুক্ত জ্যোতির্ম্মণ্ডলাকারে সূর্য্যদেব কিরণ বিকিরণ করিতেছেন। এই সূর্য্যরশ্মি বায়ুসহ পিঙ্গলামধ্য দিয়া ক্রমাগত উর্দ্ধে উঠিতেছে এবং অন্যান্য প্রবাহিণী শিরাযোগে দেহমধ্যে অনবরত বিচরণ করত, দেহস্থ অমৃত ধাতুসকল গ্রাস করিতেছে। এই স্থান হইতেই বৈশ্বানর নামক জঠরাগ্নি উত্থিত হইয়া অন্ন সকলকে পাক করিতেছে। চন্দ্রসুধাধারা ইড়াযোগে মেরুদণ্ড দিয়া অবিরত এই স্থানেই পড়িতেছে, আর সূর্য্যদেব গ্রাস করিতেছেন। এই স্থানেই চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি একত্রে মিলিত হইয়া ত্রিপুরাভৈরবী নামে ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডলরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে মন্থন ক্রিয়ায় কামবীজ উৎপন্ন করিতেছে। এই কামবীজ জ্ঞান ও বিজ্ঞানশক্তি সহ কখন উর্দ্ধে উঠিতেছে, কখন নীচে

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

নামিতেছে এবং কখন বা লিঙ্গনালে প্রবেশ করিতেছে। এইরূপে দেখা যাইতেছে পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, শূন্য এই পঞ্চ মহাভূত চক্র মধ্যে স্তরে স্তরে স্থাপিত রহিয়াছে। প্রথমে নাড়ীচক্র বা পৃথিবী-মণ্ডল, তন্মধ্যে ধাতুচক্র বা জলমণ্ডল, তন্মধ্যে উত্তাপচক্র বা অগ্নিমণ্ডল, তন্মধ্যে বর্ণগ্রাম বা বায়ুমণ্ডল, তন্মধ্যে স্বরগ্রাম বা শূন্যমণ্ডল—স্থূল দেহে এইরূপ সপ্তচক্রে সপ্ত ভূমণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব ইহাও সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, পৃথিবী হইতে জল বা নাড়ী হইতে ধাতু—জল হইতে অগ্নি বা ধাতু হইতে উত্তাপ—অগ্নি হইতে বায়ু বা উত্তাপ হইতে ভাষা অথবা বর্ণগ্রাম—বায়ু হইতে শূন্য বা বর্ণগ্রাম অথবা ভাষা হইতে নাদগ্রাম অথবা সঙ্গীত—শ্রেষ্ঠ। আবার দেখা যাইতেছে এই দেহযন্ত্র একস্থানে স্থির নাই—বায়ুই ইহাকে চালাইয়া বেড়াইতেছে। পুনশ্চ এই বায়ুর অভ্যন্তরে আবার যেন কোন পদার্থ রহিয়াছে, যাহা বায়ুকেও ইচ্ছামত চালাইতেছে। প্রাণবায়ু মুহুর্মুহু শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতেছে, কিন্তু কে, যেন প্রয়োজনবশত এমন শ্বাসকেও লঘু বা দীর্ঘ বা রোধ করিতেছে। যেন তাহার ইচ্ছা বা মননেই বায়বাদি কার্য্য করিতেছে। রাজা যেরূপ রাজাসনে বসিয়া কর্ম্মচারী বা ভৃত্যদ্বারা রাজ্য শাসন করে, সেইরূপ কে যেন কেবল দেহমধ্যে বসিয়া স্থানে স্থানে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করত দেহযাত্রারূপ রাজ্যভোগ করিতেছে। এইরূপে নিয়ত মনন করিতেছে বলিয়া ঋষিরা সেই দেহরাজকে মন এবং তাহার অধিকৃতস্থান বা রাজ্যকে মনোময়কোষ নাম দিয়াছেন। মন গুণময় পদার্থ—শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন, আঘ্রাণ এই পঞ্চবিধ অন্তঃস্থগুণ এবং ভাষণ, গ্রহণ, গমন, রেচন, রমণ—এই পঞ্চবিধ বহিস্থ গুণবিশিষ্ট; সুতরাং মন গুণময় জগতের সারসমষ্টি। জগতে এই পঞ্চবিধ গুণ ব্যতীত আর ষষ্ঠ গুণ নাই। আবার এক একটী গুণ হইতে উপ-গুণাদি উদ্ভূত হইয়াছে:—যথা একমাত্র আস্বাদে কটু, তিক্ত, অম্ল, কষায়, মধুরাদি উপগুণ আছে। আবার একমাত্র উপগুণমধ্যে কত প্রকার

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

অণুগুণও রহিয়াছে—অর্থাৎ কটু তিক্তাদিও বহু প্রকার ঃ—যথা নিম্ব এক প্রকার তিক্ত, চিরাতা অন্য প্রকার তিক্ত, পল্‌তা আবার আর এক প্রকার তিক্ত—ইত্যাদি রূপে কত প্রকার গুণ ভেদ জগতে লক্ষিত হয়। এই সমস্ত গুণের সমষ্টিই গুণজগৎ। মনই সেই গুণজগতের সারসমষ্টি। মনই এই সমস্ত বিভিন্ন গুণগ্রামের আস্বাদ এবং বিচার পূর্ব্বক তাহার উপভোগ করিতেছে। মধুমক্ষিকা যেরূপ শুণ্ডদ্বারা পুষ্প হইতে মধু আকর্ষণ করত মধুপান করে, মনও সেইরূপ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় দ্বাবা গুণ গ্রহণ করত উপভোগ করে। মক্ষিকা যেরূপ কৃষ্ণপক্ষে মধু আহরণ করত শুক্লপক্ষে পান করে, মনও সেইরূপ যতদিন না ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, ততদিন অজ্ঞানতিমিরে বিজ্ঞানবলে বস্তু হইতে বস্তুতত্ত্বমধু আহরণ কবিয়া সঞ্চয় করে। পরে জ্ঞানোদয় হইলে শুক্লপক্ষের শশীর ন্যায় ক্রমশ অজ্ঞান-অন্ধকার অপসারিত হইয়া পূর্ণব্রহ্মরূপ পৌর্ণমাসী শশীর উদয় হইলে ব্রহ্মানন্দ-মধু পান করত চিরানন্দ-সাগরে ভাসমান হয়। মক্ষিকা যেরূপ নালদ্বারা চাক প্রস্তুত করত তন্মধ্যে বাস করে, মনও সেইরূপ কামনাদ্বারা দেহচক্র নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে অবস্থান করে। এক চক্র ভাঙ্গিয়া পড়িলে মধুকর যেরূপ অন্য চক্র তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত করিতে রত হয়, মনও সেইরূপ একদেহ পতন হইলে তৎক্ষণাৎ অন্য দেহের উৎপত্তিতে নিযুক্ত হয়। এই রূপে দেখা যাইতেছে যে গুণই সৃষ্টির প্রবর্ত্তক। অতএব ভূত অপেক্ষা গুণই শ্রেষ্ঠ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ গুণাবতার এবং মনই তাহাদের সমষ্টি। মন এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তি লইয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিতেছে। এই নভোমণ্ডলে উঠিয়া সৌর জগত পরিভ্রমণ করিতেছিল, সহস্র তড়িৎবেগে আবার তৎক্ষণাৎ পাতালে নামিয়া ধাতু পরীক্ষা করিতেছে। মনের অগম্য স্থান নাই। মনই দৃশ্য সগুণ ঈশ্বর। যেমন ঈশ্বর প্রাণীর সৃষ্টি করিতেছেন, মনও সেইরূপ তন্ত্র যন্ত্রাদি কৃত্রিম প্রাণীর সৃজন করিতেছে। মন যাহা ইচ্ছা করিতেছে—যাহা

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

একান্তমনে ধ্যান করিতেছে—তাহাই তৎক্ষণাৎ উদ্ভব করিতেছে। মনই রোগাক্রান্ত হইতেছে, আবার মনই ঔষধ সৃষ্টি করিতেছে। যেমনই যাহা প্রয়োজন হইতেছে, অমনই তাহা নির্ম্মাণ করিতেছে। মন ধ্যানে মগ্ন হইয়া অমৃত পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হইতেছে। যেরূপ মহাপ্রলয় ব্যতীত ব্রহ্মারও নিবৃত্তি নাই, সেইরূপ মহানির্ব্বাণ ব্যতীত মনেরও নিবৃত্তি নাই, কেবল জন্ম-মৃত্যু-পরম্পরায় সংসার চক্রে দেহ নির্ম্মাণ করত অবিশ্রান্ত ক্রিয়াবশে ঘূর্ণায়মান রহিবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, মনের উদাসীন, মিত্র ও অরি এই ত্রিবিধ ভাব আছে। মন ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়গুণ গ্রহণ করত কখন উদাসীনবৎ অবিচলিতভাবে রহিতেছে, কখন বা মিত্রবৎ তৎ পোষকতায় নিযুক্ত হইতেছে, আর কখন বা অরিবৎ তন্নিধনে প্রবৃত্ত হইতেছে। এই তিন ভাব সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ হইতেই উৎপন্ন। মনোবেগ মূলাধারপদ্মস্থ ত্রিকোণ যোনিমণ্ডলে আঘাত করিলে, যখন যে কোণ অধিকতর আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন সেই কোণ হইতে সেই ভাবের প্রাধান্য উত্থিত হইয়া থাকে। যেমন সত্ত্বকোণে আঘাতাধিক্য বশত উদাসীনতা, রজো-কোণে আঘাতাধিক্য বশত মিত্রতা এবং তমোকোণে আঘাতাধিক্য বশত অরিভাব উৎপন্ন হয়, এইরূপে মনোবেগ কিঞ্চিৎ স্থায়ী হইলে বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত রিপুমণ্ডলে আঘাত করে। এইরূপে মনোবেগ মূলাধারচক্রস্থ রিপুমণ্ডলে আঘাত করিলে, কাম—স্বাধিষ্ঠান চক্রমধ্যস্থ বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত রিপুমণ্ডলে আঘাত করিলে, ক্রোধ—মণিপুর চক্রস্থ বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত রিপুমণ্ডলে আঘাত করিলে লোভ—অনাহত চক্রস্থ বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত রিপুচক্রে আঘাত করিলে মোহ—বিশুদ্ধচক্রস্থ বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত রিপুমণ্ডলে আঘাত করিলে মদ এবং আজ্ঞাপুরচক্রস্থ বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত রিপুমণ্ডলে আঘাত করিলে, মাৎসর্য্যের উদয় হইয়া থাকে। তিন মহাগুণভেদে ঐ রিপুগণ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দেহ হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয় হইতে মনই শ্রেষ্ঠ। পুনশ্চ দেখা যাইতেছে যেরূপ গুণ হইতে উপগুণাদি উৎপন্ন হইতেছে, সেইরূপ উক্ত ছয় রিপু হইতে হিংসা দ্বেষাদি অসংখ্য প্রবৃত্তি উত্থিত হইতেছে। এই মনেরই অভ্যন্তরে বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময়কোষ। এই বিজ্ঞান বা বিশেষজ্ঞান বা বিস্তৃতজ্ঞান বা বিকৃতজ্ঞান বা শক্তিযুক্ত জ্ঞানই মনের অধিষ্ঠাতা। সকলেই মনে করে—আমি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া অনন্তকাল অমর হইয়া জীবিত থাকি, কিন্তু কয়জন তাহাতে সফল হয়? সুতরাং দেখা যাইতেছে মন ইচ্ছা করিলেও সৃষ্টি করিতে পারে না—যত ইচ্ছা তত সৃষ্টি করিতে পারে না—যত চায় তত পায় না। কারণ মন স্বাধীন নয়, বুদ্ধিশক্তির অধীন, সুতরাং বুদ্ধি শক্তিই সৃষ্টির প্রবর্ত্তক। মন বুদ্ধির দাস, বুদ্ধিশক্তিরই নিকট ভোগ প্রার্থনা করিতেছে এবং সেই মহাশক্তি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছেন। সুতরাং যাহার বুদ্ধি যতদূর নির্ম্মল, সে ততই সৃষ্টি করত অভীষ্ট লাভ করিতেছে। পশ্বাদির বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময়কোষ একেবারে মলিন বা মোহাচ্ছন্ন, সেইজন্য তাহারা যা স্বভাবত জানে তাহাই জানে। ধীশক্তি বা চিন্তা-শক্তির চালনা করিতে পারে না। সুতরাং হিতাহিত বিবেচনা—এইটী শুভ, এইটী অশুভ—এটা আয়ুষ্কর ওটা মারাত্মক—এইরূপ বিচার করিতে পারে না। এইরূপে যে মনুষ্য অচিন্তাশীল বা যাহার বুদ্ধি পশ্বাদির ন্যায় তমসাবৃত, সেও শুভাশুভ বিবেচনা করিতে পারে না। আপাতত মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইয়া, মধুলুব্ধ মক্ষিকার ন্যায়—ক্ষণিক সুখের জন্য প্রাণ হারায়। যে জীবন রক্ষার জন্য মধু খাইতে যায়, অবশেষে নিরুপায়ে ভীষণ অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া, হায়! হায়! করিতে করিতে সেই জীবনই বিসর্জ্জন দেয়। যে কামিনী ও কাঞ্চন—জননী ও ধাত্রী, যে কামিনী হইতেই জীবন, এবং যে কাঞ্চন হইতেই সেই জীবনের পুষ্টি লাভ সেই কামিনী ও কাঞ্চন লোভেই—সেই কামিনী ও কাঞ্চনের দুর্ব্ব্যবহারেই

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

মরণ। আবার সেই কামিনী ও কাঞ্চন বা শক্তি ও ভূত বলেই—সেই বুদ্ধি ও ক্রিয়াবলেই মরণেরও মরণ হইতেছে বা ব্রহ্মনির্ব্বাণও লাভ হইতেছে। অতএব সেই মহাশক্তির সারসমষ্টি বা বুদ্ধিশক্তি, মনাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এদিকে ভৌতিক জগতেও সেইরূপ শক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শক্তিই জড় পরমাণুর্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, জড়সকলকে শক্তিযুক্ত করিতেছ। আর্য্য ঋষিগণ সেই নিমিত্তই—সাকারে, নিরাকারে—সগুণে, নির্গুণে—বামাচারে, দক্ষিণাচারে—পঞ্চভাবে, পঞ্চমকারে—ইত্যাদিরূপ বিধিমত প্রকারে সেই মঙ্গলামঙ্গলময় মহাচণ্ডীর বা মহাশক্তির আরাধনা করিতে মোহান্ধ জীবগণকে শিখাইয়াছেন। ব্রহ্মময়—জ্ঞানময়—জ্যোতির্ম্ময় ঋষিগণের এই অদ্ভুত শক্তিমাহাত্ম কোন্ দেহাভিমানী ক্ষণিকবাদী অবধারণ করিতে সমর্থ হইবে? সুতরাং কেই বা সাকারে নিরাকার—অন্ধকারে আলোকাকার হেরিয়া—এই মূর্ত্তিমান ব্যোম রহস্য ভেদ বা মূর্ত্তিউপাসনাতত্ত্ব অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবে? অতএব দেখা যাইতেছে প্রথমে অন্নজাত দেহ, তদভ্যন্তরে শ্বাস-প্রশ্বাসবান্ প্রাণাদি বায়ু, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়শক্তি, তদভ্যন্তরে মন এবং তদভ্যন্তরে বুদ্ধি। এই বিজ্ঞান বলেই মানবজাতি ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ কৃত্রিম ব্রহ্মাণ্ড—দেহানুরূপ কৃত্রিম দেহও সৃজন করিতেছে এবং এই জীব-জন্তু-সমাকুল সসাগরা পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেছে। জলকে স্থল করিতেছে—স্থলকে জল করিতেছে—নাদকেও রাগে আলাপ এবং কালকেও তালে যুক্ত করিতেছে। যেরূপ মহাশক্তি বা মহাকালী রুদ্ররূপী মহাকালেরও উপর দণ্ডায়মানা, সেইরূপ এই ধীশক্তিও কালের উপর অধিপত্য করিতেছে। এই ধীশক্তিই মহাশক্তিরস ারসমষ্টিরূপে ব্রহ্মরন্ধ্রে বিজ্ঞানশক্তিমণ্ডলাকরে—আজ্ঞাপদ্মে হাকিনী শক্তিমণ্ডলরূপে,—বিশুদ্ধ পদ্মে শাকিনীশক্তিমণ্ডলরূপে,—অনাহত পদ্মে কাকিনীশক্তিমণ্ডলরূপে—মণিপূর পদ্মে লাকিনীশক্তিমণ্ডলরূপে—স্বাধিষ্ঠান পদ্মে রাকিনীশক্তিমণ্ডল রূপে এবং মূলাধার পদ্মে ডাকিনীশক্তিমণ্ডলরূপে

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

জড়দেহ ও গৌণ দেহকে শক্তি প্রদান করিতেছে। এইরূপ আধারভেদে শক্তিভেদ বিলক্ষণরূপে চাক্ষুষ হইতেছে। ভ্রূমধ্যে এক প্রকার স্থিতিস্থাপক মেদগত শক্তি, কণ্ঠে এক প্রকার অস্থিগত শক্তি, বক্ষে এক প্রকার ভস্ত্রার ন্যায় শক্তি, নাভিমূলে এক প্রকার কুঞ্চনকারী শক্তি, লিঙ্গমূলে এক প্রকার ধাতুউত্তেজনকারী শক্তি এবং মূলাধরে এক প্রকার অগ্নিবর্দ্ধনকারী শক্তি এবং যোনিমূলে কুণ্ডলিনী শক্তি। এই সমুদয় শক্তির মিলিত নাম বিজ্ঞানময়কোষ। এই বিজ্ঞানময়কোষে দেববল, দৈত্যবল, মুনিবল, যোগিবল, ঋষিবল ও তপোবল প্রভৃতি যাবতীয় শক্তিই অন্তর্ভূত রহিয়াছে। অভ্যাস বা সাধনে তৎ সমুদয়ই জাগরিত হইয়া থাকে। এই বুদ্ধিবলেই মন চলিতেছে। অতএব মন অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ। পুনশ্চ দেখা যাইতেছে বুদ্ধির ভিতরেও যেন কোন অদৃশ্য অনুমেয় পদার্থ রহিয়াছে। যে পদার্থ দেহস্থ সকলকে চৈতন্য যুক্ত করিতেছে। বুদ্ধিশক্তি সমস্ত সৃজন করিতে পারে, কিন্তু চৈতন্যের সৃষ্টি করিতে পারে না। মনুষ্যও বুদ্ধিবলে অবিকল মনুষ্য সৃজন করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে জীব চৈতন্য প্রদান করিতে পারে না। যেরূপ দংশনমাত্রেই সর্পবিষ চকিতের ন্যায় উর্দ্ধগামী হইয়া, পুনশ্চ অধোগামী হওত, ক্রমে আবার উর্দ্ধে উঠিয়া শরীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ কোন বিষয় ইন্দ্রিয়পথে পতিত হইবামাত্রই প্রথমে উক্ত বিষয় বা বিষয়ের সার-সমষ্টি বা ভাব চকিতের ন্যায় চৈতন্যপথে উঠিয়া, পুনরায় নামিয়া ক্রমে ঘোর হইয়া উঠিতে থাকে এবং মনকে চঞ্চল করে। কোন পদার্থ গাত্রোপরি পতিত হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে চৈতন্যের উদ্রেক হয়—অর্থাৎ কি পড়িল এইরূপ জ্ঞান হয়, ক্ষণপরেই উক্ত জ্ঞান প্রবাহিত হইয়া বুদ্ধিতে অবতরণ করত, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সদসৎ বিবেচনায় প্রবৃত্ত হয়—অর্থাৎ চক্ষু কিম্বা যে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই হউক, সেই বস্তুর সহিত মনের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা নিরূপণ করিয়া দেয়। এইরূপে বুদ্ধি ভাল মন্দ বিচার

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন॥ ৪২॥

করিয়া দিলে, উক্ত বিষয় মনে আধার প্রাপ্ত হইয়া মনকে ক্ষুভিত করে। আরও দেখা যায় অন্ধকেও শিক্ষা দিলে, সে শ্বেত কৃষ্ণাদি বর্ণ বোধে তৎ তৎ শব্দ ব্যবহার বা প্রয়োগ করিতে পারে; কিন্তু তাহার কদাপি বর্ণজ্ঞান বা বর্ণের ভাবজ্ঞান হয় না। এইরূপে পক্ষীরাও শিক্ষাবলে মনুষ্যের ন্যায় বাক্য সকলের অর্থবোধিনী যোজনা করিতে পারে, কিন্তু বাক্যের জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বুদ্ধির অতীত জ্ঞান বা চৈতন্যদায়ক কোন নিরাকার পদার্থ আছেই আছে এবং সেই জ্ঞানের পর আর কোন পদার্থই জ্ঞানগোচর হয় না। সুতরাং জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অনাদি, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জ্ঞান নিত্য অর্থাৎ তাহার ভাবান্তর নাই, ভাবান্তর থাকিলে কখন অদ্বৈত হইত না। কোন সুন্দর রূপ দর্শন করিলে যেমন রূপজ্ঞান হয়, কুরূপ দর্শনেও সেই একই প্রকার রূপজ্ঞান হইয়া থাকে, কেবল মনের মাত্র অবস্থান্তর হইয়া থাকে। এইরূপে রূপ দেখিলেও যে জ্ঞান হয়, রব শুনিলেও সেই জ্ঞান হইয়া থাকে; কেবল ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া গ্রাহ্য হয় বলিয়া, দর্শনজ্ঞান, শ্রবণজ্ঞান ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সকল বিষয়েই একমাত্র জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানের গুণভেদ নাই, ইহা নির্গুণ। পুনশ্চ এক সময়ে যে বস্তু দেখিলে যে জ্ঞান হয়, অন্য সময়ে তাহাকে দেখিলেও সেই জ্ঞান হয়। অদ্য যাহাকে দেখিলে যেরূপ দর্শনজ্ঞান হয়, কল্য তাহাকে দেখিলেও সেইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। কোন অতীতকালে যাহাকে দেখিলে যে জ্ঞান হইয়াছিল, বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে তাহাকে দেখিলেও সেইরূপজ্ঞান হইয়া থাকে এবং হইবে। অবস্থাভেদে মনের সংস্কারের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু তাহার জ্ঞান বা অনুভবশক্তি একই প্রকার হইয়া থাকে। জাগরণে যাহাকে দেখিয়া যেরূপ জ্ঞান হয়, স্বপনেও তাহাকে দেখিলে সেইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, অথচ স্বপ্নে বিষয় সকল বর্ত্তমান থাকে না

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

রামের যে বস্তু দর্শন করিয়া যে জ্ঞান হয়, শ্যামেরও তাহা দেখিয়া সেইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে রুচি অনুসারে মনের অবস্থা বিভিন্ন হইতে পারে। অতএব জ্ঞান নিরাকার,অনাদি,নির্গুণ ও নিত্য। পুনশ্চ দেখা যাইতেছে শরীর প্রাণহীন হইলে, মাংসাস্থি নির্ম্মিত দেহ বিকৃত হয় এবং সংযুক্ত ভূতগণ বিযুক্ত হইয়া, তৎ তৎ সম্বন্ধীয় মহাভূতে মিশিয়া যায়; অথবা অপর প্রাণীতে উদরসাৎ করত ভিন্ন আকারে পরিণত করে। সুতরাং লয় বা মৃত্যু বলিতে—যাহাকে যেরূপে দেখিয়াছিলাম, তাহা আর সেরূপে নাই, কিন্তু রূপান্তরে আছে—এই মাত্র বুঝায়, অথবা—আছে কিন্তু খুঁজিলে পাই না, নাই বলিয়া ভান হয় বা তাহার জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হয়—এইরূপ বোধ হয়। আবার যাহাকে উৎপত্তি বা বৃদ্ধি কহে তাহাও নূতন নহে। পার্থিবরস উদ্ভিদাকারে পরিণত এবং উদ্ভিদগণ কীটাণু, পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি প্রাণীর আকারে পরিণত হইতেছে। সুতরাং পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ বলিলে—কোন শুক্রবিন্দু শক্তিযুক্ত হইয়া জরায়ু মধ্যে প্রবিষ্ট হওত—মক্ষিকাগণ যেরূপ নালদ্বারা চাক প্রস্তুত করে—সেইরূপে প্রথমত শোণিত, পরে দুগ্ধ, পরে অন্নাদি আকর্ষণ পূর্ব্বক একটী দেহ উৎপন্ন করত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া অসংখ্য পরিমাণ পার্থিবরসাদিকে নরাকারে পরিণত করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। আবার একশত বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হইল বলিলে—একশত বৎসরের অর্জ্জিত বা সঞ্চিত পঞ্চভূতাদি নরদেহাকার ত্যাগ করত—পঞ্চবটীর পঞ্চবৃক্ষ পঞ্চস্থানে স্থানান্তরিতের ন্যায়, অথবা পঞ্চপাণ্ডবদিগের অজ্ঞাত বাসের ন্যায় অজ্ঞাত বা অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিল—লুপ্ত হইল না। যেরূপ ফলের উপরিভাগস্থ ত্বগাদির রূপান্তর বা ধ্বংস হইলেও, তাহার মধ্যস্থ বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও বৈলক্ষণ্য হয় না, সেইরূপ অন্নময় কোষের ধ্বংস হইলেও, দেহবৃক্ষের বীজরূপ মনাদিযুক্ত লিঙ্গ-শরীরের পুনর্দেহোৎপাদিকা ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। বস্তু মাত্রই এক না এক ভাবে থাকে—যায় না, কেবল রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ—যায় আর আসে এবং আসে আর যায়

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি পর হন ॥ ৪২ ॥

এইরূপে অনবরত যাতায়াত করে। অতএব পুনর্জন্ম অকাট্য সিদ্ধান্ত এবং আত্মার ধ্বংস নাই, ইহা এক প্রকার প্রত্যক্ষ হইতেছে। শক্তিই দেহরূপ বস্ত্র পরাইয়াছিল এবং সেই শক্তিই আবার কাড়িয়া লইল, সুতরাং মরিল। যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি অবশ হইলে বা সেই শক্তির হ্রাস হইলেও জ্ঞানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না; তখন দেহান্তে বা দেহ একেবারে শক্তিহীন হইলে, লিঙ্গ শরীরও বর্ত্তমান থাকে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যখন লোকে আমার মন, আমার দেহ, আমার শক্তি ইত্যাদিরূপ কহিয়া, আপনাকে উক্ত পদার্থ সকল হইতে পৃথক্ রাখিতেছে, তখন আমিই আমি বা আত্মাই আমি, সুতরাং দেহান্তে দেহীর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ বই আর কি হইতে পারে? জগতে যাহা নাই এমন কিছুই নূতন হয় না এবং যাহা আছে তাহারও লোপ হয় না, সে এক না এক আকারে আছেই আছে। অতএব এক আছেই আছে এবং যাহার ভাবান্তর নাই সেই আছে। কর্ম্মচক্রে ভাবান্তর প্রাপ্ত হইতে হইতে এই জগদৈশ্বর্য্য যেখানে আসিয়া স্থির হইতেছে, সেই ভগবানই আছেন। তিনি সৎ চিৎ ও পূর্ণানন্দ। চিন্তাশূন্যতাই আনন্দের লক্ষণ। মনুষ্যগণ কাম্য বস্তু প্রাপ্তে যে সুখ উপলব্ধি করিয়া থাকে, তাহার কারণ যে বস্তু প্রাপ্ত হইবার জন্য মন এতকাল ব্যাস্ত হইয়া ছিল, সেই বস্তু যেমনই পাইল অমনি তচ্চিন্তা রহিত হইল। বুদ্ধি এতক্ষণ যাহার লাভালাভ বিচার করিতেছিল, এক্ষণে তাহাকে পাইয়া স্থির হইল, সুতরাং মনে আনন্দের উদয় হইল। কিন্তু মন স্থির থাকিবার নয়, যেমনই এক বস্তু পাইতেছে, অমনিই অন্য বস্তু চাহিতেছে, সুতরাং চিন্তা ইহতে চিন্তান্তরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে বলিয়া সেই সুখ স্থায়ী হয় না। বুদ্ধির পরিপাক হইলেই জ্ঞান নির্ম্মল হইয়া আনন্দরূপ কিরণ প্রকাশ করে। অর্থাৎ বয়সে যেরূপ শিশুর বুদ্ধি প্রস্ফুটিত ও পরিপক্ক হয়, সেইরূপ জন্ম জন্মান্তরে সাধিতে সাধিতে কোন জন্মে বুদ্ধি স্থির হইলে তখন জ্ঞানের মলীনতা দূর হইয়া মন জ্ঞানেই অবস্থান করিলে নির্ব্বাণ মুক্তি বা অখণ্ড আনন্দ প্রাপ্ত হয়।

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুঝি-পর হন ॥ ৪২ ॥

জ্ঞানই আনন্দের আলয়, সুতরাং জ্ঞানে অবস্থান করিতে পারিলেই পরাশান্তি. তাহাতে আর সন্দেহ কি? মন স্থির হইলেই জ্ঞানে অবস্থান করে এবং আনন্দ প্রাপ্ত হয়। এই জন্য ঋষিগণ ইহাকে আনন্দময়কোষ সংজ্ঞা দিয়াছেন। শক্তির অভ্যন্তরে এই আনন্দময়-কোষ বা জ্ঞানমণ্ডল। ব্রহ্মরন্ধ্রে ত্রিকোণ যোনিরূপা বিজ্ঞান শক্তির মধ্যে জ্ঞানবিন্দু বা বাণলিঙ্গের অধিষ্ঠান এবং আজ্ঞাপূরচক্রে শুক্ল নামে মহাসিদ্ধ লিঙ্গ; বিশুদ্ধ চক্রে ছগলাণ্ড নামক সিদ্ধ লিঙ্গ; অনাহতচক্রে পিনাকী নামে সিদ্ধ লিঙ্গ; মণিপূরচক্রে রুদ্র নামে সিদ্ধ লিঙ্গ; স্বাধিষ্ঠানচক্রে বাল নামে সিদ্ধ লিঙ্গ; এবং আধারচক্রে দ্বিরণ্ড নামে জ্ঞানবিন্দু বা সিদ্ধ লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। জ্ঞানধারা প্রবাহিত হইয়া এই ছয় চক্রে বা ভাণ্ডে অবস্থান করত নাড়ীমধ্যে শক্তি মনাদি দ্বারা উত্তরোত্তরে আবৃত হওত প্রবাহিত হইয়া সর্ব্ব শরীরকে চৈতন্যযুক্ত করিতেছ এবং আনন্দ প্রদান করিতেছ। সেই অখণ্ড আনন্দ বা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবার জন্য ঋষিগণ যোগপথ আবিষ্কার করিয়া মোহান্ধ জীবগণকে চিরচরিতার্থ করিয়াছেন। অর্থাৎ যম, নিয়ম ও আসন দ্বারা তিন-মহাভূতাত্মক অন্নময়কোষকে, প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণময়কোষকে, প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে, ধ্যান দ্বারা মনকে এবং ধারণা দ্বারা বুদ্ধিকে জয় করিলে, তবে সমাধিরূপ মহামন্দিরস্থ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে এবং জীব মুক্ত হইবে। এক্ষণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে পৃথিবী হইতে জল শ্রেষ্ঠ—জল হইতে অগ্নি শ্রেষ্ঠ—অগ্নি হইতে বায়ু শ্রেষ্ঠ—বায়ু হইতে শূন্য শ্রেষ্ঠ—শূন্য হইতে ইন্দ্রিয়গুণ শ্রেষ্ঠ—ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ—মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ—বুদ্ধি হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ—জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ বা দ্বিতীয় পদার্থই নাই। আবার দেখা যাইতেছে, শ্রেষ্ঠই নিকৃষ্টের আধার। অতএব পৃথিবীর আধার জল—জলের আধার অগ্নি—অগ্নির আধার বায়ু—বায়ুর আধার শূন্য—শূন্যের আধার ইন্দ্রিয় শক্তি—ইন্দ্রিয়ের আধার মন—মনের আধার বুদ্ধি—বুদ্ধির আধার জ্ঞান—

ইন্দ্রিয় দেহের পর, তার পর মন।
মনঃ-পর বুদ্ধি, তিনি বুদ্ধি-পর হন ॥ ৪২ ॥

জ্ঞান স্বয়ংই সকলের আধার, সুতরাং ভাসমান। পুনশ্চ দেখা যাইতেছে, যে যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতেই তাহার সত্ত্বা বা বিদ্যমানতা রহিয়াছে—অর্থাৎ পৃথিবীর সত্ত্বা জলে—জলের সত্ত্বা অগ্নিতে—অগ্নির সত্ত্বা বায়ুতে—বায়ুর সত্ত্বা শূন্যে—শূন্যের সত্ত্বা ইন্দ্রিয়গুণে—ইন্দ্রিয়ের সত্ত্বা মনে—মনের সত্ত্বা বুদ্ধিতে—বুদ্ধির সত্ত্বা জ্ঞানে—জ্ঞান স্বয়ংই সৎ। আবার দেখা যাইতেছে, যাহাতে যাহার সত্ত্বা আছে, সেই তাহার আদি, সেই তাহার মধ্য এবং সেই তাহার অন্ত। যেরূপ বায়ুতে অগ্নির সত্ত্বা আছে, অতএব বায়ুই অগ্নির উৎপত্তির কারণ বা অগ্নি প্রস্তুত করণের জন্য বায়ুই আবশ্যক। অগ্নির মধ্যের বা প্রকাশের বা অস্তিত্বেরও বায়ুই কারণ বা অগ্নিকে রক্ষা করিতে বায়ুর আবশ্যক বা বায়ু ভিন্ন অগ্নির অগ্নিত্ব থাকে না। এবং অগ্নির অন্তেও বায়ুই কারণ বা অগ্নি বায়ুতেই নির্ব্বাণ বা লয় হয়। অতএব পৃথিবীর আদি, মধ্য এবং অন্ত, জল—জলের আদি, মধ্য এবং অন্ত, অগ্নি—অগ্নির আদি, মধ্য ও অন্ত, বায়ু—বায়ুর আদি, মধ্য, ও অন্ত, শূন্য—শূন্যের আদি, মধ্য ও অন্ত, ইন্দ্রিয়গুণ—ইন্দ্রিয়ের আদি, মধ্য ও অন্ত, মন—মনের আদি, মধ্য ও অন্ত, বুদ্ধি—বুদ্ধির আদি, মধ্য ও অন্ত, জ্ঞান—জ্ঞান অনাদি, অমধ্য বা অবিকৃত ও অনন্ত। আবার দেখা যাইতেছে, সংসার বা জগৎ বলিতে একদিকে জ্ঞান হইতে বুদ্ধি—বুদ্ধি হইতে মন—মন হইতে ইন্দ্রিয়গুণ—ইন্দ্রিয় হইতে শূন্য—শূন্য হইতে বায়ু—বায়ু হইতে অগ্নি—অগ্নি হইতে জল—জল হইতে পৃথিবী—এবং পৃথিবী হইতে যাবতীয় চেতনাচেতনাদি পদার্থ উদ্ভূত হইতেছে। আর অন্যদিক দিয়া পৃথিবী জলে—জল অগ্নিতে—অগ্নি বায়ুতে—বায়ু শূন্যে—শূন্য ইন্দ্রিয়গুণে—ইন্দ্রিয় মনে—মন বুদ্ধিতে—এবং বুদ্ধি জ্ঞানে পতিত হইতেছে। অতএব হে অর্জ্জুন! এই দুই পথ লইয়াই জগৎ। এবং এই দুই পথই ব্রহ্মময়—একটী ব্রহ্মের বিস্তারপথ আর একটী ব্রহ্মের সঙ্কোচপথ। সুতরাং ব্রহ্মই জগৎ এবং জগৎই ব্রহ্ম, আর যিনি এইরূপে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত--তিনিই সেইজ্ঞানরূপী পরম ব্রহ্ম॥ ৪২ ॥

হেন বোধে ব্রহ্মে বোধি, বাঁধিয়া মানস।
কামরূপ দুরাসদ শত্রুরে বিনাশ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্যা
উদ্দীপক উপনিষৎ স্বরূপ ভগবদ্গীতা
নামক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন
সংবাদে কর্ম্মযোগ নামে
তৃতীয় অধ্যায়।

এক্ষণে হে অর্জ্জুন! তুমি উক্তরূপ বুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মকে ধারণা করত মনসংযম পূর্ব্বক কামরূপ দুর্জ্জেয় শত্রুকে বিনাশ কর, অর্থাৎ যখন স্পষ্টই প্রমাণ হইল—ব্রহ্মের প্রশ্বাসে সৃষ্টি ও নিশ্বাসে লয়, তখন কুম্ভকে স্থিতি বা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণপ্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধান্ত হইতেছে। অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানই স্ফীত হইয়া অজ্ঞান সংযোগে এই জগৎ উৎপন্ন করত আবার জ্ঞানাভিমুখেই আসিতেছে। অতএব পরমজ্ঞান বা পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম বা স্থিরবস্তু স্বদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিদেশে অস্থির ভাবে যে জন্ম মৃত্যু পরম্পরায় সংসারপথে ভ্রমণ করে, তাহাকেই মায়া বা প্রাকৃতিক বা অধর্ম্ম পথ কহে। আর দূরদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে স্বদেশের নাম মনে উদয় হওয়ায়, যে স্থানের বস্তু, যে পথ দিয়া সেই স্থানাভিমুখী হয়, সেই পথকেই যোগপথ বা ব্রাহ্মণপথ বা ধর্ম্মপথ কহে। অথবা স্থাপকতাই অধর্ম্ম এবং স্থিতিই ধর্ম্ম কিম্বা অসারে ব্যষ্টি হওয়া বা বিস্তৃত হওয়াই অধর্ম্ম এবং সারে সমষ্টি বা সঙ্কুচিত হওয়াই ধর্ম্ম। সংসারচক্রের অধর্ম্ম ও ধর্ম্ম এই দুই গতি। কি স্থাবর কি জঙ্গম সকলেই এই দুয়ের কোন না কোন পথে নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে। যে কোন ধর্ম্মই মানে না, সে অধর্ম্ম বা প্রাকৃতিক পথে চলিতেছে। স্থূল শরীরের আরামে সতত বিস্তৃত বা ক্ষুভিত হইতেছে, আর নূতন নূতন ভোগ্য বস্তু সকল সৃজন করত তাহাদের সম্ভোগ রূপ দারুণ নিগড়ে আবদ্ধ হইতেছে। অতএব দুই বই আর গতি নাই—হয় উৎপন্ন হও, নয় লয় হও—হয় বৃদ্ধি হও, নয় হ্রাস হও—হয় আশাবশে ঘুরিতে থাক, নয় আশাশূন্য হইয়া স্থির হও—হয় ভোগী হইয়া মানসিক ও শারীরিক রোগ ভোগ কর, নয় ত্যাগী হইয়া বিজ্ঞান ও ক্রিয়াযোগে স্বাস্থ্য লাভ কর। দুয়ের এক করিতে হইবেই হইবে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি এই রূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করত এই ধর্ম্ম পথেরই পথিক হইয়া ব্রহ্মাভিমুখী হও, সুতরাং মনঃসংযম পূর্ব্বক নিষ্কাম হও। ॥ ৪৩ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গৌড়ীয় গীতা।

চতুর্থ অধ্যায়।

জ্ঞান যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

আদিত্যে অব্যয় যোগ পূর্ব্বে কহেছিনু।
আদিত্য মনুরে কহে, ইক্ষ্বকুরে মনু ॥ ১ ॥
পরম্পরা প্রাপ্তে জ্ঞাত রাজর্ষিনিচয়।
কালেতে এ হেন মহা যোগ নষ্ট হয় ॥ ২ ॥
তোমাকে কহিনু আজি যোগ পুরাতন।
ভক্ত, সখা, কহি তাই রহস্য উত্তম ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন হে অর্জ্জুন! আমি এই অব্যয় কর্ম্মযোগ পূর্ব্বে সূর্য্যদেবকে কহিয়াছিলাম, পরে সূর্য্যদেব মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে কহেন ॥ ১ ॥ এইরূপ পরম্পরারূপে অর্থাৎ একের নিকট হইতে অপরে প্রাপ্ত হইয়া, রাজর্ষিগণ জ্ঞাত হইয়াছিলেন; কিন্তু কালক্রমে সেই মহাযোগ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে—অর্থাৎ এই কর্ম্মযোগ রাজর্ষিদিগের মধ্যেই প্রশস্ত, কিন্তু এক্ষণে রাজগণ বিষয়মদে মত্ত হইয়া আর কেহ এই পরম যোগ সাধন করে না ॥ ২ ॥ হে অর্জ্জুন! অদ্য আমি তোমাকে সেই পুরাতন যোগ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তুমি আমার একান্ত ভক্ত ও সখা, সেই নিমিত্ত তোমাকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া এই পরম গুহ্য বিষয় কহিলাম ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন।

অগ্রে বিবস্বত পরে জনম তোমার।
তাঁরে কহ তুমি অগ্রে কিসে জানি আর ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

বহু জন্ম হয় মোর তোমারও অর্জ্জুন!
আমি সব জ্ঞাত তায় তুমি জ্ঞানশূন ॥ ৫ ॥
অজ আমি অব্যয়াত্মা ভূতের ঈশ্বর।
স্বমায়ায় ধরি কায় প্রকৃতি উপর ॥ ৬ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ! অগ্রে সূর্য্য দেবের এবং পরে আপনার জন্ম হইয়াছে, অতএব আপনি তাঁহাকে অগ্রে কহিলেন এ কি প্রকার? বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৪ ॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অর্জ্জুন! আমি যে কেবল এই ত্রেতা যুগে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি এমন নহে; আমি লীলাছলে, রূপ রূপান্তরে, কাল কালান্তরে, দেশ দেশান্তরে, বহু জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, এবং তুমি ও ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ পূর্ব্বক বহু জন্ম পরিভ্রমণ করিয়াছ; তবে আমাতে ও তোমাতে প্রভেদ এই—আমি সমষ্টি. পূর্ণ-ব্রহ্ম-অবতার, স্বইচ্ছায় এই সৃষ্টি স্থিতি লয়রূপ লীলাখেলা খেলিতে খেলিতে, জগত অধর্ম্ম অন্ধকারে আবৃত হইলে বর্ষান্তে রামধনুর ন্যায় প্রকাশমান হই, সুতরাং এই অদ্ভুত জন্ম-রহস্য সবিশেষ জ্ঞাত আছি; কিন্তু তুমি ব্যষ্টি জীব, মায়াতে আচ্ছন্ন হইয়া কর্ম্মবশে ভ্রামিত হইতেছ, সুতরাং এই পরম জন্ম বৃত্তান্ত কিছুই অবগত নও ॥ ৫ ॥ হে অর্জ্জুন! আমি জন্মহীন, অবিনশ্বর-স্বভাব ও ভূতের ঈশ্বর হইয়াও, স্বীয় মায়ায় প্রকৃতির উপরে অধিষ্ঠিত হইয়া কায়া ধারণ করি। অর্থাৎ যেমন মহাসমুদ্র হইতে প্রস্রবণ উত্থিত হইয়া, পুনরায় সেই মহা-জলেই নিপতিত হইতেছে; সেইরূপ এই ব্যষ্টি জগৎ, মহা সমষ্টি বা মহা আত্মা বা মহাচৈতন্য হইতে ক্ষুভ্যমান জলবিন্দুর ন্যায় প্রকাশিত হইয়া সেই মহাসমষ্টিতেই মিশিতেছে। মিশিতেছে আবার

অজ আমি অব্যয়াত্মা ভূতের ঈশ্বর।
স্বমায়ায় ধরি কায় প্রকৃতি উপর ॥ ৬ ॥

উঠিতেছে—উঠিতেছে আর পড়িতেছে—পড়িতেছে আর উঠিতেছে—এই-রূপে অনন্তকাল ক্রিয়মাণ হইতেছে। যেরূপ প্রস্রবিত জলবিন্দু, জল ভিন্ন কোন নূতন পদার্থ নহে—অর্থাৎ জলই স্ফীত হইয়া বিন্দুর আকার ধারণ করিয়াছে; সেইরূপ এই জল-স্থল চরাচর-সমাকুল ব্রহ্মাণ্ড পরমাত্মা ভিন্ন কোন নূতন পদার্থ নহে। অতএব ব্রহ্মই—জগতে, পরমাত্মাই—জীবাত্মায়, নির্গুণই—গুণে, এবং নিরাকারই—সাকারে স্ফীত বা বিস্তৃত হইতেছে। আবার সেই বিরাটব্রহ্ম বা জগৎ-ব্রহ্ম বা ক্ষুভ্যমান নিরাকার বা সাকার নিরাকারেই কুঞ্চিত হইতেছে—আবার তৎক্ষণাৎ ঐরূপে বিস্তৃত হই-তেছে। সুতরাং এই স্থিতিস্থাপক জগতের উৎপত্তি আছে,কিন্তু লোপ নাই, অর্থাৎ জগৎ অনাদি না হইলেও অনন্ত—অর্থাৎ এক না এক আকারে আছেই আছে। কিন্তু পরমাত্মা অজ বা অনাদি ও অনন্ত। যেরূপ ঘটের অভ্যন্তরেও যে আকাশ বা শূন্যময় স্থান, ঘটের বাহিরেও সেই আকাশ, কেবল ঘটাকাশ ও মহাকাশ সংজ্ঞাভেদ মাত্র, পরন্তু উভয়ই অভিন্ন পদার্থ; সেইরূপ ব্রহ্ম ও জগৎ, পরমাত্মা ও জীবাত্মা, সূক্ষ্ম ও স্থূল, নিরাকার ও সাকার, নির্গুণ ও সগুণ, অন্তর ও বাহ্য—অভিন্ন পদার্থ। অর্থাৎ বাহ্যেও যা হইতেছে, যে স্রোত বহিতেছে—অন্তরেও তাহাই চলি-তেছে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থেও যাহা ঘটিতেছে—এক পদার্থেও তৎসমুদয় উদ্ভূত হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডেও যাহা চলিতেছে—দেহভাণ্ডেও তাহাই চলিতেছে। বাহিরেও যে কৃষ্ণাবতার যেরূপে লীলা করিতেছেন—ভিতরেও সেই জ্ঞানরূপী পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার সেই রূপে লীলা করিতেছেন। একের লীলা একই হইয়া থাকে। যমক সন্তানের আকর্ষণ যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—অর্থাৎ যেমন যমকের একটীর যেরূপ পরিবর্ত্তন বা পীড়াদি যে সময়ে উৎপন্ন হয়, অপরটীরও সেইরূপ পরিবর্ত্তন সেই সময়ে হইয়া থাকে—ইহা যিনি চক্ষে দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন বাহ্যের সহিত অন্তরের কি সম্বন্ধ? অতএব আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন জগৎই এক, এবং একই তিন। সুতরাং জগতে কিছু অসম্ভব বা অঘটন বা

অজ আমি অব্যয়াত্মা ভূতের ঈশ্বর।
স্বমায়ায় ধরি কায় প্রকৃতি উপর ॥ ৬ ॥

নূতন বা অবিশ্বাসযোগ্য পদার্থই নাই। যে যাহা ধারণা করিতে না পারে, সে তাহাকেই অসম্ভব বা কাল্পনিক কহিয়া, তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া থাকে। অতএব অবিশ্বাস বা অসম্ভব অর্থে ধারণার অতীত এবং অবিশ্বাসী বা নাস্তিক বলিতে ধারণা-অনুযায়ী বিশ্বাসকারী বই আর কি হইতে পারে? যেরূপ মহাকাশ ব্যতীত ঘটাকাশের অস্তিত্ব—মহাভূত ভিন্ন কোন ভূতেরই সম্ভব—মহাগুণ বা মহত্তত্ত্ব ভিন্ন কোন গুণেরই সত্ত্বা—মহাশক্তি ভিন্ন কোন শক্তিরই বিদ্যমানতা—মহাসমষ্টি ভিন্ন কোন ব্যষ্টিরই স্থায়িত্ব—সৎ ভিন্ন অসতের এবং পুরুষ ভিন্ন প্রকৃতিরই অস্তিত্ব—থাকিতে পারে না; সেইরূপ পরমাত্মা বা চৈতন্য-ভাণ্ডার ভিন্ন জীবাত্মার বা জীবচৈতন্যেরও অস্তিত্ব অসম্ভব। অতএব যখন জীবাত্মার বা আত্মজ্ঞানের অস্তিত্বে কেহ সন্দেহ করিতে পারে না—অর্থাৎ যখন কেহ আমি নাই বা আমাজ্ঞান নাই বা আত্মা নাই এরূপ বলিতে অথবা আত্মার লোপ অনুভব করিতেও পারে না, তখন মহাসমষ্টিরূপ পরমাত্মারও অস্তিত্ব সতত জাজ্বল্যমান। যদি এই জগৎরূপ প্রস্রবণ নিরতই প্রস্রবিত না থাকিত, অর্থাৎ যদি সৃষ্টি, স্থিতি লয় অনবরত না হইত—কিছুকাল হইয়া নিস্তব্ধ হইত; তাহা হইলে অদ্বৈতে দ্বৈতাপত্তি হইত। কারণ যে কারণে জ্ঞানরূপ কারণ হইতে শক্তিরূপ কার্য্যের প্রকাশ হইয়াছে, সেই কারণের অভাব হইলে জ্ঞানরূপ কারণেরও ভাবান্তর হইয়া পড়ে—কিন্তু তাহা নয়। মহা-প্রলয়ান্তেও পুনঃসৃষ্টি হইতেছে এবং সৃষ্টি, স্থিতি, লয় পুনঃ পুনঃ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিতেছে। যেরূপ প্রস্রবণোত্থ জলবিন্দুমধ্যস্থিত কীট মহাসমুদ্রের নিকট না আসিলে, মহাজলের ভাবনা বা ধারণাই করিতে পারে না; সেই-রূপ ব্যষ্টি জীব, আচারে বাহ্য শুদ্ধি এবং বিচারে বা বিজ্ঞানে অন্তঃশুদ্ধি করত মহাজলের সন্নিকটস্থ না হইলে, কিরূপে সেই মহাসমুদ্ররূপী পরমাত্মার ধারণা করিবে? কিন্তু পরমাত্মা যথার্থ চাক্ষুষ পদার্থ। অতএব পুরুষের প্রাধান্য এবং প্রধানের অজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ—অর্থাৎ এক

অজ আমি অব্যয়াত্মা ভূতের ঈশ্বর।
স্বমায়ায় ধরি কায় প্রকৃতি উপর ॥ ৬ ॥

আছেন, তাঁহারই এক পাদ স্বইচ্ছায় প্রকৃতিস্থ বা শক্তিযুক্ত এই মহাবাক্য বাক্যমাত্র নহে—দৈববাণী বা জ্বলন্ত স্বতঃসিদ্ধান্ততত্ত্ব। প্রথমে নিরাকার বিন্দুমাত্র ছিল এবং সেই বিন্দুর একপাদ ইচ্ছায় অজ্ঞানে আবৃত হইয়া কেবলমাত্র দুই সীমাবিশিষ্ট সরল রেখাকার ধারণ করিল। অমনি জগতে ঊর্দ্ধ অধঃ, সৎ অসৎ, আলোক অন্ধকার, দক্ষিণ বাম, পুরুষ স্ত্রী, ইত্যাদিরূপ দ্বিভেদ উত্থিত হইয়া—একই দুই এবং দুইই এক হইয়া অবস্থান করিল অর্থাৎ যেরূপ সরল রেখারই এক সীমা এক দিক, এবং অন্য সীমা অন্য দিক; সেইরূপ ঊর্দ্ধেরই একদিক অধঃ, সতেরই একদিক অসৎ, আলোকেরই অন্তরাল বা একদিক অন্ধকার, দক্ষিণেরই একদিক বাম, এবং পুরুষেরই এক দিক বা এক অঙ্গ স্ত্রী। এইরূপে জ্ঞান অজ্ঞানে, সৎ অসতে, ঊর্দ্ধ অধে, আলোক অন্ধকারে, অন্তঃ বাহ্যে, দক্ষিণ বামে, পুরুষ স্ত্রীতে অখণ্ড বা অভিন্নরূপে সৃষ্টি মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছে। অনন্তর উক্ত দ্বিসীমাবিশিষ্ট সরল রেখা বা প্রকৃতি-আশ্রিত পুরুষ ক্ষুভ্যমান হইয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণে ত্রিকোণ বিশ্বযোনির আকার ধারণ করত যথাক্রমে জগৎ চরাচর উৎপন্ন করিল। অর্থাৎ সত্ত্ব গুণ বা সাত্ত্বিক অহঙ্কার ক্ষুভিত হইয়া অন্তর্ভাগ হইতে অবকাশশক্তি বা দিক্‌দেবতাকে উৎপন্ন করিল; পরে দিক্ হইতে শোধনশক্তি বা বাতদেব—বাত হইতে দহনশক্তি বা অর্কদেব—অর্ক হইতে ক্লেদনশক্তি বা প্রচেতাদেব—এবং প্রচেতা হইতে ধারণশক্তি বা অশ্বিনীকুমারের জন্ম হইল। পুনশ্চ সত্ত্বগুণ অধোভাগ হইতে আবরণশক্তি বা বহ্নিদেব—বহ্নি হইতে আকর্ষণশক্তি বা ইন্দ্রদেব—ইন্দ্র হইতে উত্তেজনশক্তি বা উপেন্দ্রদেব—উপেন্দ্র হইতে পোষণশক্তি বা মিত্রদেব—মিত্র হইতে জননশক্তি বা প্রজাপতি—এই পঞ্চ উপদেবতার সৃজন করিল। রজোগুণ ক্ষুভিত হইয়া—অন্তর্ভাগ হইতে শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শ্রবণগুণ—শ্রবণ হইতে ত্বগেন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্পর্শনগুণ—স্পর্শন হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য দর্শনগুণ—দর্শন হইতে রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য আস্বাদনগুণ—

অজ আমি অব্যয়াত্মা ভূতের ঈশ্বর।
স্বমায়ায় ধরি কায় প্রকৃতি উপর ॥ ৬ ॥

আস্বাদ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য আঘ্রাণগুণ এবং অন্তর্ভাগ হইতে বাগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভাষণগুণ—ভাষণ হইতে পাণীন্দ্রিয়গ্রাহ্য গ্রহণগুণ—গ্রহণ হইতে পাদেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গমনগুণ—গমন হইতে পায়ুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রেচনগুণ—রেচন হইতে উপস্থেন্দ্রিয়গ্রাহ্য রমণগুণ—এইরূপে পঞ্চ গুণ ও পঞ্চ উপগুণ যথাক্রমে উৎপন্ন করিল। তমোগুণ—অন্তর্ভাগ হইতে শব্দরূপ তন্মাত্র—শব্দ হইতে স্পর্শ তন্মাত্র—স্পর্শ হইতে রূপ তন্মাত্র—রূপ হইতে গন্ধ তন্মাত্র এবং অধরাঙ্গ হইতে শূন্য—শূন্য হইতে বায়ু—বায়ু হইতে অগ্নি—অগ্নি হইতে জল—জল হইতে পৃথিবী—এই পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ ভূত উৎপাদন করিল। এক্ষণে ভূতগণ পরমাণু অবস্থায় রক্ষিত হইল এবং ক্রমশ শক্তি ও গুণ প্রভাবে পরস্পর পরস্পরে পঞ্চীকৃত হইল। অর্থাৎ একের অর্দ্ধাংশে সেই ভূত এবং অপর অর্দ্ধাংশে অন্য চারি ভূত সমভাগে মিশ্রিত হইয়া, মহাভূতরূপে উত্তরোত্তরে দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিয়া রহিল। অতঃপর পৃথিবী স্ফীত হইয়া দুগ্ধোত্থিত নবনীতের ন্যায় সৃষ্টির সারভূত—উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ—এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীর যথাক্রমে উৎপত্তি করিল। এইরূপে এক মাত্র পরব্রহ্ম হইতেই এই সচরাচর জগৎ ইচ্ছাক্রমে মায়া বশত উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, এবং ফণিমধ্যস্থ মণির ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া, মায়া পর্য্যন্তও মায়াহীন ব্রহ্মে লীন হইতেছে। অতএব এই সংসার চক্রের যেমন এক দিক তমসাবৃত হইতেছে, অপর দিক হইতে অমনি আলোক প্রকাশিত হইতেছে। এক দিক হইতে যেমন মায়া রাহু ব্রহ্মচন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে, অমনি অপর দিক হইতে মুক্তি হইতেছে—যেমন হরণ হইতেছে, অমনি পূরণ হইতেছে—যেমনি এক দিক হ্রাস হইতেছে, অমনি অন্যদিক বৃদ্ধি হইতেছে—একের জন্ম হইতেছে, অপরের মৃত্যু হইতেছে—এক পড়িতেছে, আর এক উঠিতেছে—এইরূপে এই জগৎ সংসারে সাম্যই রাজত্ব করিতেছে। অতএব যাহার রাজ্য ক্ষয়হীন—ক্রিয়মাণ হইলেও চিরক্রিয়মাণ—অস্থির হইলেও চিরঅস্থির এবং যে ভাবেই থাকুক্ চিরবিদ্যমান, সুতরাং নিত্য ;

অজ আমি অব্যয়াত্মা ভূতের ঈশ্বর।
স্বমায়ায় ধরি কায় প্রকৃতি উপর ॥ ৬ ॥

সেই রাজ্যের রাজা যে নিত্য, তাহা কে না নির্ব্বাক্ হইয়া স্বীকার করিবে? অতএব সেই অদ্বৈত নিত্য চৈতন্যই মলিন হইয়া পুনরায় নির্ম্মল হওত সচেতন প্রাণিদেহ ধারণ পূর্ব্বক ক্রমশ সার-সূক্ষ্ম হইয়া পরমাত্মা মুখেই আসিয়া, পরব্রহ্মেরই উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য পূর্ণ ব্রহ্ম-অবতার-রূপে অবতীর্ণ হইতেছে—অর্থাৎ মন্থনাদি অনুসারে নবনীর যেরূপ তারতম্য হইয়া থাকে, চৈতন্যের নির্ম্মলতা অনুসারে প্রাণি-জগতেও সেইরূপ তারতম্য হইয়া থাকে। সেই হেতু দেখা যাইতেছে উদ্ভিজ্জে ভৌতিকত্বের, স্বেদজে গুণত্বের, অণ্ডজে শক্তির এবং জরায়ুজে বিজ্ঞানাদি যাবতীয় পদার্থের সারত্ব রহিয়াছে। পুনরায় জরায়ুজের সমষ্টিমধ্যে পশ্বাদিতে অন্নময়কোষের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানাদির পূর্ণতা প্রতিভাত হয় নাই, মনুষ্যে কেবল ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত মনোময়কোষ বিকসিত হইয়াছে, বিজ্ঞান ও জ্ঞান মলিন ভাবে আছে, যোগসাধনে নির্ম্মল হয়। দেবতাগণে বিজ্ঞান বা ধীশক্তি পর্য্যন্ত পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে এবং অবতারে জ্ঞানের পূর্ণতা প্রতিভাত হইয়া যেন বিশ্ব-কুসুমের অজ্ঞানাবৃত ব্রহ্মকেশর অজ্ঞান ভেদ করত স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। জ্ঞানের পর আর কিছু নাই, সুতরাং অবতারগণই ব্রহ্মের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি। যেরূপ অনবরত মন্থনে দুগ্ধ হইতে অনবরত নবনীত উত্থিত হইতে থাকে, সেইরূপ ভবদুগ্ধ হইতে কর্ম্মরূপ মন্থনে অনন্তকাল প্রাণীর উদ্ভব হইবে। এবং যেরূপ নবনীত হইতে শেষ সার-সমষ্টি ঘৃত পর্য্যন্তও উত্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ উন্নতির চরমসীমা জ্ঞানরূপী পূর্ণব্রহ্ম অবতাররূপে যথাসময়ে অবতীর্ণ হয়েন, এবং চিরকালই হইবেন। অতএব অবতারের অবতরণ বা অবতার মাহাত্ম্য অবশ্যম্ভাবী ও অকাট্য সিদ্ধান্ত ॥ ৬ ॥

ধর্ম্ম-গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান যবে।
আত্মারে সৃজন করি আমি ত হে তবে ॥ ৭ ॥
সাধুরে তারিতে, দুষ্টে বিনাশিতে আর।
ধর্ম্মে স্থিতে যুগে যুগে সম্ভব আমার ॥ ৮ ॥
জন্ম কর্ম্ম দিব্য মোর যে জানে বিচারে।
দেহান্তে না পুন জন্মে, পায় সে আমারে ॥ ৯ ॥
মন্ময়, নী—রাগ-ভয়-ক্রোধ, মদাশ্রিত।
জ্ঞানে তপে শুদ্ধ হয়ে মদ্ভাবেরে প্রাপ্ত ॥ ১০ ॥

হে অর্জ্জুন! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি বা বিপ্লব, এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি পূর্ণব্রহ্মরূপী আত্মাকে সৃজন করি—অর্থাৎ যেরূপ আমারই নিয়মে, উত্তাপের বৃদ্ধি হইলেই বারি বর্ষণ, অহঙ্কারের বৃদ্ধি হইলেই অধঃপতন—ইত্যাদিরূপ স্বতঃসিদ্ধ পরিণাম সকল উদ্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলেই ধর্ম্ম আপনি সমুত্থিত হয়, সুতরাং আমি পূর্ণ জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া দেহ ধারণ পূর্ব্বক আপনি আপনাকে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥ হে অর্জ্জুন! আমি সাধু-গণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য, দুরাচারদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন হেতু যুগে যুগে—অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥ হে অর্জ্জুন! আমার এই পূর্ণ-জ্ঞান বিজ্ঞান-প্রকাশক অবতাররূপ জন্ম এবং অলৌ-কিক শক্তিসম্পন্ন অসাধারণ কর্ম্ম সকল, যে ব্যক্তি যথার্থরূপে অবগত হইতে পারে, দেহান্তে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না—কারণ দিব্যজ্ঞান হইলেই সে আমাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥ কতলোকে জ্ঞানে অন্তর ও তপস্যায় বাহ্য শুদ্ধি করণান্তর, রাগ ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতেই চিত্ত একনিষ্ঠ এবং আমারই উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া আমারই জ্ঞানময় বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হই-য়াছে ॥ ১০ ॥

যে ভাবে যে ভজে মোরে, সেই ভাবে ভজি।
মম-পথ-অনুগামী পার্থ! নররাজি ॥ ১১ ॥
দেবতা অর্চ্চয়ে লোকে কর্ম্ম-সিদ্ধি আশে।
শীঘ্র হয় কর্ম্ম-ফল সুসিদ্ধ মানুষে ॥ ১২ ॥

হে অর্জ্জুন! আমাকে যে, যে প্রকারে ভজনা করে, আমিও তাহাকে সেই প্রকারে ভজনা করিয়া থাকি—অর্থাৎ যে আমাকে একান্ত ভক্তিদ্বারা, যে সঙ্কল্প করিয়া, যে বিধি অনুসারে, ভজনা করে, আমি তাহার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, নারিকেল ফলের মধ্যস্থিত জলের ন্যায় অগ্রসর হইয়া থাকি। এবং যে অনাচারী বা কপটাচারী, অভক্তি বা কপট ভক্তির সহিত আমাকে অহিত সঙ্কল্পে ভজনা করে, আমি তাহাকে মাতঙ্গ-ভক্ষিত কপিত্থের ন্যায় কপট-সিদ্ধি বা ক্ষণভঙ্গুর সুখ প্রদান করিয়া থাকি। অতএব হে অর্জ্জুন! এইরূপে কি সৎ কি অসৎ সকল প্রকার মনুষ্যই আমার পথ অনুসরণ করিতেছে, কারণ সকলেই—যাহাতে কখন দুঃখের লেশ মাত্র ভোগ করিতে না হয়—যাহাতে কখন জরা মরণাদি আক্রমণ করিতে না পারে—যাহাতে অনন্ত কাল অনন্ত জীবন অনন্ত আনন্দে অতিবাহিত হয়—এইরূপ আত্মার প্রীতি অন্বেষণ করিতেছে, এবং তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য আমার প্রকৃতিজ কোন না কোন মূর্ত্তির ভজনা বা ভাবনা করিতেছে, সুতরাং আমারই বস্তু আমারই পথে আসিতেছে, যেহেতু দেহে আমিই ব্রহ্মরূপী, জ্ঞানময়, আত্মবৎ, অব্যয়, অক্ষয়, অখণ্ড আনন্দ ॥ ১১ ॥ হে অর্জ্জুন! লোকে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অভীষ্ট দেবতাগণকে পূজা করিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাদের তৎ তৎ দেবতায় অচলা ভক্তি থাকায়, তাহারা এই মনুষ্য লোকেই মন্ত্রাদি দ্বারা দৃষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে। এই জন্য লোকে ফলের বশীভূত ও ভৌতিক ব্যাপারে মুগ্ধ হইয়া সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে ও যত আশা করে ততই প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু আশার নিবৃত্তি রূপ পরাশান্তি প্রাপ্ত হয় না ॥ ১২ ॥

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৭ ॥

হে অর্জ্জুন! আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ সৃজন করিয়াছি—অর্থাৎ সত্ত্বগুণ প্রধানকে ব্রাহ্মণ করিয়া জ্ঞানরক্ষণ কর্ম্মে ব্রতী করিয়াছি, সত্ব-রজ প্রধানকে ক্ষত্রিয় করিয়া শৌর্য্যবীর্য্যাদি সম্পন্ন বিজ্ঞান বা শক্তিরক্ষণ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছি, রজ-তম প্রধানকে বৈশ্য করিয়া কৃষি বাণিজ্যাদি গুণরক্ষণ কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়াছি এবং ঘোর তিমিরময় তমোগুণাপন্নকে শূদ্র করিয়া জ্ঞানশক্তি ও গুণের পুষ্টিসাধনার্থে কেবল ভৌতিকপরিশ্রমে ভূতবর্দ্ধন কর্ম্মে বা সেবায় নিরত রাখিয়াছি। অর্থাৎ কি উদ্ভিজ্জ, কি স্বেদজ, কি অণ্ডজ, কি জরায়ুজ, প্রাণীমাত্রই গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে চারিভাগে বা বর্ণে বা জাতিতে বিভক্ত, সুতরাং সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ও প্রাকৃতিক অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবিধ বর্ণভেদ জগতে থাকিবেই থাকিবে। অতএব এই চতুর্ব্বিধ মনুষ্য কেহবা সংসারচক্রের মায়াপথে, আর কেহবা যোগপথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। এই মায়াপথ গুণানুসারে চারি ভাগে বিভক্ত এবং কর্ম্মানুসারে অষ্টাঙ্গযুক্ত। মায়াপথের প্রথম বিভাগকে মোহবর্ত্ম, দ্বিতীয় বিভাগকে অহঙ্কারবর্ত্ম, তৃতীয় বিভাগকে সংশয়বর্ত্ম এবং চতুর্থ বিভাগকে বিক্ষেপবর্ত্ম কহে, প্রত্যেক বর্ত্মের দুই দুইটা অঙ্গ আছে যথাঃ—মোহবর্ত্মের—অনাচার ও অনিয়ম, অহঙ্কারবর্ত্মের—বিলাস ও ভোগ, সংশয়বর্ত্মের—ক্ষোভ ও অভিমান এবং বিক্ষেপবর্ত্মের—ভয় ও অনুতাপ। এইরূপে যোগপথেরও চারি বিভাগ এবং অষ্ট অঙ্গ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে যথাঃ—ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ, বিজ্ঞানমার্গ, জ্ঞানমার্গ; এই চারিটী বিভাগ এবং ভক্তির—যম ও নিয়ম, যোগের—আসন ও প্রাণায়াম, বিজ্ঞানের—প্রত্যাহার ও ধ্যান, জ্ঞানের—ধারণা ও সমাধি; এই আটটী অঙ্গ। যাহারা মায়াপথে চলিতেছে, তাহাদের সাধারণ নাম অধার্ম্মিক এবং যাহারা যোগপথে চলিতেছে, তাহাদের সাধারণ নাম ধার্ম্মিক। পন্থানুসারে বা স্বভাবানুযায়ী মোহবর্ত্মের অধার্ম্মিকগণকে—বর্ব্বর, অহঙ্কার বর্ত্মের অধার্ম্মিকগণকে—দাম্ভিক, সংশয়বর্ত্মের অধার্ম্মিকগণকে—নাস্তিক

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

এবং নিক্ষেপবর্ত্মের পথিকগণকে—মুমুক্ষু কহে। এইরূপে সাধনানুসারে ভক্তিমার্গের ধার্ম্মিকগণকে—ভক্ত বা শৈব অথবা জড় বা রূপ বা নাম বা শিব উপাসক, যোগমার্গের ধার্ম্মিকগণকে—যোগী বা সৌর অথবা ক্রিয়া বা গুণ বা ব্রহ্মা উপাসক, বিজ্ঞানমার্গের ধার্ম্মিকগণকে—বিবেকী বা শাক্ত অথবা দেবী বা শক্তি উপাসক এবং জ্ঞানমার্গের ধার্ম্মিকগণকে-বৈষ্ণব বা জ্ঞানী বা পরমহংস বা ব্রহ্মউপাসক কহে। মানব জগৎ সম্যক অনুশীলন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কতক গুলি মনুষ্য ভোগী, আর কতক গুলি ত্যাগী অর্থাৎ কতক গুলি লোক স্থূলকেই পরম পদার্থ জ্ঞান করে, স্থূলদেহরই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে, সুতরাং স্থূলরূপেই বশীভূত। ইহারা স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত কোন পদার্থের পোষকতা করে না, সুতরাং সূক্ষ্মের ধারণা করিতে না পারিয়া বা সূক্ষ্মের প্রাধান্য জানিয়াও স্থূলকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করে। অতএব ইহারা জড়বাদী বা মায়ামুগ্ধ এবং আশাই ইহাদের প্রবর্ত্তক। ইহারা এক প্রকার স্ত্রীজাতি, সেই নিমিত্ত কামিনী ও কাঞ্চনের অপব্যবহারই ইহাদের প্রধান লক্ষ। মানবজাতি মধ্যে আরও দেখা যাইতেছে যে, কতকগুলি লোক আছে, তাহারা স্থূলে মুগ্ধ বা অন্ধ হয় না, অর্থাৎ স্থূলকে দাসত্বে বরণ করত প্রয়োজন সিদ্ধ করে মাত্র, কিন্তু কদাপি এমন দুর্লভ মানব জীবন অনিত্য অকিঞ্চিৎকর ক্ষণভঙ্গুর পদার্থের জন্য নষ্ট করে না। ইহারা দৃশ্য পদার্থ ছাড়িয়া কেবল অদৃশ্য ধর্ম্ম বা ব্রহ্ম পদার্থের জন্য ধাবমান হয়, সুতরাং বাহ্য বিষয়ে উদাসীনবৎ—অর্থাৎ ইহাদের সকলই আছে, অথচ যে যেখানকার সে সেই খানেই আছে। বাহ্যের বস্তু বাহ্যেই আছে, অন্তরে প্রবেশ করিতে পায় না এবং অন্তরের বস্তু অন্তরেই আছে, বাহির হইতে চায় না। জঠরানল প্রজ্জ্বলিত হইল, অমনি যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত অন্ন আহুতি প্রদান করিল, কিন্তু ভোগীদিগের ন্যায় পলান্নের লালশায় হাতের অন্ন ছাড়িয়া অন্যস্থানে অন্নের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় না, অথবা তিলার্দ্ধকাল রসনার আরামের জন্য অনন্তকাল ব্যথিত হয় না। বাসের আবশ্যক হইলে,

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

অমনি কৌপীন, চর্ম্ম, বল্কলাদি পরিধান পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ করিল, কিন্তু ভোগীদিগের ন্যায় মহামূল্য পরিধেয় ও মণি মাণিক্যাদি অঙ্গভূষার জন্য লালায়িত হইয়া, কদাচ জীবনসঙ্কটে পতিত হয় না—অঙ্গের শোভার জন্য কখন মনের শোভা নষ্ট করে না। এইরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে ত্যাগীদিগেরও ভোগীদিগের ন্যায় বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু ত্যাগীরা সেই সকল বস্তুদ্বারা জীবনকে রক্ষাই করিয়া থাকে, কদাচ বিষয়তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জীবনকে আহত বা হত করে না। জীবনের জন্যই আহাবীয় বস্তুসকল—বস্তুর জন্য কখন জীবন নহে—অর্থাৎ চৈতন্যশালী জীবন রক্ষার নিমিত্তই জড় বস্তুর প্রয়োজন, কিন্তু জড় বস্তু রক্ষার জন্য কখন এমন জ্ঞানবিজ্ঞানাদিসম্পন্ন মনুষ্য জীবনের আবশ্যক হইতে পারে না। কারণ যদি চৈতন্য হইতে জড়ই প্রধান হইত—যদি অজ্ঞান হইতে জ্ঞান বা প্রকৃতি হইতে পুরুষের উৎপত্তি হইত—যদি ভৌতিক পরমাণুর বৈজ্ঞানিক সংযোগে জীবচৈতন্য উদ্ভূত হইত—বলিতে কি, যদি রসায়নে জ্ঞান প্রস্তুত হইত—তাহা হইলে কেইবা গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া জ্ঞানরূপ অদৃশ্য নিধির অন্বেষণে কায়মনচিত্তে নিযুক্ত হইত? —কেইবা জনসমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘোরতর নিবিড় অরণ্যমধ্যে অষ্টাঙ্গ যোগসাধনরূপ কঠোর তপস্যাচরণে ব্রতী হইত?—আর কেইবা সকল প্রকার পার্থিব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সগুণ বিষ্ণুপদকেও তুচ্ছ জ্ঞান করত ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্য বৈরাগ্য আশ্রয় করিত? তাহা হইলে মনুষ্যগণও কলবলাদির ন্যায় অবিকল জীবচৈতন্যবিশিষ্ট মনুষ্যও সৃজন করিত এবং কৃতান্তের করাল কবলে কদাচ নিপতিত হইত না। এইরূপে মনুষ্যমধ্যে অধার্ম্মিক ও ধার্ম্মিক এই দুই শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আবার অধার্ম্মিক বা মায়াপথের পথিকদিগের মধ্যে এমন কতকগুলি লোক দেখা যাইতেছে যে, তাহারা একেবারে মোহাচ্ছন্ন। তাহাদের বুদ্ধি ঘোর তমসাবৃত, এমন কি, তাহাদিগকে বাক্‌শক্তিযুক্ত পশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ তাহারা কেবল পশুবৎ আহার, নিদ্রা এবং মৈথুনেরই বশবর্ত্তী।

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

সুতরাং তাহাদিগের আহারাদিতেও কোন আচার নাই এবং কর্ম্মেও কোন নিয়ম নাই। তাহারা সম্যক্ বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা করিতে পারে না, সুতরাং অপরিণামদর্শী—অর্থাৎ বিহিত ভবিষ্যৎ চিন্তায় পরাঙ্মুখ। মায়ার প্রথম কার্য্যই ভ্রান্তি—অর্থাৎ এক বস্তুতে অপর বস্তুর ভ্রম। যেরূপ পথিমধ্যে কোন স্থলে রজ্জু পড়িয়া থাকিলে, কোন পথিক হটাৎ তাহাকে সর্প মনে করিয়া চমকিয়া উঠে এবং কেহবা উক্ত রজ্জুকে যথার্থ রজ্জুজ্ঞানে তদুপরি পদবিক্ষেপ করত অকুতোভয়ে চলিয়া যায়, সেইরূপ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হওয়াই ভ্রান্তি বা অজ্ঞান এবং রজ্জুতে প্রকৃত রজ্জুজ্ঞান হওয়াই অভ্রান্তি বা জ্ঞান। অতএব ভ্রান্তি বা মোহই মায়ার প্রথম লক্ষণ। অপরিণামদর্শিতা বা অচিন্তাশীলতাই এই ভ্রান্তির কারণ। যেহেতু বস্তুর পরিণামই বস্তু—কার্য্যের ফলই কার্য্য। অতএব এই বস্তুময় জগতের পরিণামই স্বর্ব্বস্ব। পিতা পুত্রকে তাড়না করিতেছেন, সন্তানের শুভ—পরিণামের জন্য। সন্তান পিতাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেছে, তাহার সুখকর—পরিণামের জন্য। গুরু শিষ্যকে তিরস্কার করিতেছেন, শিষ্যের উজ্জ্বল—পরিণামের জন্য। শিষ্য ঈশ্বর-অভেদে গুরুর পদসেবা করিতেছে, তাহার মঙ্গলময়—পরিণামের জন্য। রাজা একদিকে শান্তি স্থাপন করিতেছেন, রাজ্যের উন্নতি বা শান্তিময়—পরিণামের জন্য; আবার অন্যদিকে প্রজাকে গভীর সন্তাপসাগরে নিপতিত করিয়া, বায়ু যেরূপ বস্ত্রাদির আর্দ্রতা শোষণ করে, সেইরূপ প্রজাদিগের শরীর হইতে অবিশ্রান্ত শ্রম বা ধাতু বা শোণিত শোষণ করিতেছেন, রাজ্যের অধঃপতন বা আয়ুক্ষয় বা ঘোর—পরিণামের জন্য। প্রজাগণ ধর্ম্ম-অবতার জ্ঞানে রাজার প্রতি অচলা ভক্তি স্থাপন করিতেছে, তাহাদিগের অচলা শান্তি রূপ—পরিণামের জন্য। অসার সংসারমায়া দূরে নিক্ষেপ করত ভীষণ কালান্তক হিংস্রক প্রাণীপরিপূর্ণ নির্জ্জন অরণ্যানীমধ্যে পদ্মাসনে সমাসীন সমাধিস্থযোগী তপস্যাচরণ করিতেছেন, ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ পরম—পরিণামের জন্য। জগতে যে যাহা করিতেছে, সকলই—পরিণামের জন্য;

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

সুতরাং পরিণামই সকলের সর্ব্বস্ব। সকলেই ভবিষ্যতের উদ্দেশে কার্য্য করিতেছে, কিন্তু কাহারও কার্য্য কালে বন্ধন ঘটাইতেছে এবং কাহারও কার্য্য বন্ধন খণ্ডন করিতেছে। অর্থাৎ কেহবা স্তুপাকার ধাতু বা লোষ্ট্র বা অর্থ বা বিষয়সঞ্চয়ে অমূল্য মানবজীবন উৎসর্গ করিতেছে, আর কেহবা সেই স্তুপাকার লোষ্ট্রবৎ মায়াময় সংসার হইতে জ্ঞানরূপ অয়স্কান্ত মণি লাভ করত, মণির আলোকে প্রকাশমান যোগপথ দেখিতে পাইয়া জীবন প্রবাহকে সেই পথেই প্রবাহিত করিতেছে। অতএব দেখা যাই-তেছে—ভবিষ্যতই আসিয়াছে—ভবিষ্যতই আসিতেছে—এবং ভবিষ্যতই আসিবে। কারণ অতীত বহুকাল অতীত হইয়াছে—সুখ হউক—দুঃখ হউক—ভাল হউক—মন্দ হউক—যাহা হউক—তাহা হউক—হউক বা না হউক—যাহা গিয়াছে তাহা আর আসিবে না—ব্রহ্মাণ্ড দিলেও তাহা আর মিলিবে না—সুতরাং অতীত ঘোর অন্ধকারময়। বর্ত্তমান মেঘান্তরিত রৌদ্রের ন্যায়—আসিতেছে দেখিতেছি—আইল ত চলিয়া গেল—ধরিতে ধরিতে সরিয়া গেল—এই ছায়া ছিল, পলক না ফেলিতে ফেলিতে রৌদ্র আসিয়া সব রৌদ্রময় করিয়া দূরবর্ত্তী ছায়ার প্রান্তে মিশিল। অতএব অতীত ছায়ামাত্র, ভবিষ্যত জ্যোতির্ম্ময় এবং বর্ত্তমান নিরাকার আয়তন-বিহীন রেখার ন্যায় ছায়া ও আলোকের ব্যবধান মাত্র। অতএব যাহা বর্ত্তমান বা আছে বলিয়া লোকে মনে করে, তাহা নাই এবং যাহা ভবিষ্যত বা নাই বলিয়া লোকে মনে করে, তাহাই আছে। সুতরাং ভৌতিক জগত মিথ্যা এবং নিরাকার জ্ঞানরূপী ব্রহ্মই সত্য। হায়! মায়ামুগ্ধ ভ্রান্ত জীবগণ কি অন্ধ! চক্ষে দেখিতেছে জগৎ প্রতি পলকে রূপান্তরিত হইতেছে; পলকে পলকে কাল জগৎকে নব নব রূপের বস্ত্র পরিধান করাইতেছে; যে রূপ দেখিয়া মূঢ়গণ মুগ্ধ হইতেছে, দেখিতে দেখিতে সেই রূপ চলিয়া যাইতেছে; তবু মূঢ়গণ বালকের ন্যায়—আমি ঐ রূপ লইব—এই প্রকার প্রলাপ বাক্য কহিতেছে আর তৎপ্রতি ধাবমান হইতেছে। যে রূপে মুগ্ধ হইতেছে

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

সে রূপ আর পাইতেছে না—তদনুরূপ পাইতে পারে—কিন্তু তথাপি অজ্ঞান হইয়া তাহাকেই ধরিতে ছুটিতেছে। অদ্য যে বীজ রোপণ করিলাম কল্য তাহাকে আর সে অবস্থায় দেখিতে পাই না। আবার দেখিতে দেখিতে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল এবং কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষাকার ধারণ করিল। অতএব সেই বীজই ক্ষণে ক্ষণে আকার পরিবর্ত্তন করিতেছে। এইরূপে নিখিল জগৎ সংসার নিয়তই কালচক্রে রূপান্তরিত হইতেছে। স্থূল চক্ষে উক্ত পরিবর্ত্তন অধিক পরিমাণে বা কিছুকালের পরিবর্ত্তন একত্রিত না হইলে দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব কালের সত্ত্বা বা স্থায়িত্ব বা স্থিরভাব অথবা বর্ত্তমান কাল নামমাত্র—থাকিয়াও নাই। ভবিষ্যতই প্রত্যক্ষ। ভবিষ্যতই বর্ত্তমান আর সবই অতীত—ব্রহ্মই আলোক আর সবই অন্ধকার—ধর্ম্মই সৎ আর সবই অসৎ। মূঢ়গণ বা মায়াপথের পথিকগণ, মুখে ভবিষ্যত বা পরকাল বা ঈশ্বর মানুক বা নাই মানুক—ধর্ম্ম কর্ম্ম করুক আর নাই করুক—জ্ঞাতসারেই হউক, অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, কেবল ভবিষ্যতেরই জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অতএব ভবিষ্যতই বর্ত্তমান—ভবিষ্যতই চাক্ষুষ। সুতরাং পরকালে বিশ্বাসই জ্ঞান এবং অবিশ্বাসই অজ্ঞান। অতএব অবিশ্বাস বা বিশ্বাসে অপারদর্শিতাই মায়াপথের লক্ষণ অথবা প্রথম বিভাগ এবং অনাচারী অনিয়মী ম্লেচ্ছগণই এই পথের পথিক। ইহারাই মোহবর্ম্মের পথিক বা বর্ব্বর বা মলিনতমোগুণাচ্ছন্ন মূঢ় শূদ্র, কারণ ভোগীদিগের পরিচর্য্যাই ইহাদের কার্য্য। পুনশ্চ দেখা যাইতেছে অধার্ম্মিকমধ্যে এরূপ কতকগুলি লোক আছে, যাহারা সর্ব্বদাই অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। আপনিই আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অপরকে তাচ্ছিল্য করাই ইহাদের জীবনের সার সংকল্প এবং হিংসাই ইহাদিগের প্রধান বৃত্তি। অতএব দুরাশাই ইহাদিগের পথ প্রদর্শক এবং বিলাস ও ভোগই ইহাদের কর্ম্ম। এই দম্ভপূর্ণ হিংস্রক বিলাসিগণ—ব্যাঘ্রের অপেক্ষাও ভীষণ মাংসলোলুপ—শৃগালের অপেক্ষাও অধিকতর ধূর্ত্ত—এবং ভুজঙ্গের অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর বিষাল।

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

দুর্ব্বলকে পীড়ন বা নষ্ট করিয়া, তাহার নিকট হইতে কাম্যবস্তু লাভ করত আশাচরিতার্থ করাই ইহাদের প্রধান ব্রত, সুতরাং ইহারা ঘোর অত্যাচারী। ইহারা স্বভাবে সন্তুষ্ট নয়; কেবল স্বভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কৃত্রিম স্বভাব প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত। ইহারা মুখে সংস্কারাদি কাহারও দাসত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু কার্য্যকালে তুচ্ছ আশার দাস হইয়া সামান্য ইন্দ্রিয়গণের কর্তৃত্বাভিমানে থাকিয়াও, আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া সকলকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেছে। আপনি যাহা বুঝে তাহাই ঠিক, আর সকলি ভুল, এই ভাবিয়া মহা মহা যোগী ঋষিগণকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতেছে। এই জাতীয় মনুষ্যই এক্ষণে জগতে অধিক। ইহারা গুণের আভাপ্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং কামনা বিস্তার করত ক্রুর কৌশলে কাম্য বস্তু উৎপন্ন করিয়া নিয়ত কর্ম্মজালে জড়িত হইতেছে। উত্তালতরঙ্গমালাসমাকুল গভীর সাগরমধ্যস্থলে তরণী নিপতিত হইলে, নাবিক যেরূপ দুঃখ ও শোকে বিহ্বল হয়, দাম্ভিকগণও সেইরূপ এই ভবসমুদ্রমধ্যে নিপতিত হইয়া কাম্য বস্তুর অপ্রাপ্তিরূপ দুঃখ এবং প্রাপ্ত বস্তুর ক্ষয় বা অরক্ষণরূপ শোকতরঙ্গাঘাতে নিপীড়িত হইতেছে। দুরাশারূপ প্রবল বায়ু তাহাতে আবার তাহাদিগকে কখন বা নভোমার্গে উঠাইতেছে আর কখন বা অতল জলধীতলে নিক্ষেপ করিতেছে—ক্রোধরূপ কুজ্‌ঝটিকা যেন নিয়ত দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। ইহারা কিছুতেই তুষ্ট নয়, এই পায়, আর চায়, সুতরাং চাওয়া আর নিবৃত্তি অথবা পাওয়াও আর হয় না। মায়ার বিপরীত কাণ্ড—চাহিলে চাহিতে হয়—অনন্তকাল চাহিতে হয়—চাতকের ন্যায় মেঘ পানে সতৃষ্ণ নয়নে নিরন্তর চাহিয়া থাকিতে হয়—পাওয়া আর যায় না। কিন্তু না চাহিলে পাওয়া যায়—চাহিতে না জানিলে স্বভাব আপনি দেয়—চাহিতে শিখিলে আর দিবে না—আবার না চাহিলেও দিতে ক্ষান্ত হয় না। সন্তানের যেরূপ অরুচি হইলে জননী নানা প্রকার উত্তম উত্তম সুস্বাদু সামগ্রী যত্নপূর্ব্বক সন্তানের নিকট ধরিয়া দিয়া

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

থাকেন, সেইরূপ প্রকৃতি দেবী তাঁহার সন্তান বৈরাগ্য আশ্রয় করিলে, বিধিমতে তাহার বিষয়ে রাগ বা রুচি জন্মাইতে ক্রটি করেন না—ইহা স্বতঃসিদ্ধান্ত। এইরূপে দাম্ভিকগণ সুখের জন্য আয়োজন করিতেছে, কিন্তু পরিণামে বিত্তাদিক্ষয়জনিত শোকে শোকাকুল হইতেছে—যেই এক বস্তুর প্রাপ্তিসুখ অনুভব করিতে যাইতেছে, অমনি পশ্চাৎ হইতে আশার পর আশা আসিয়া মনকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে—যেখানের সামগ্রী সেই খানেই রহিতেছে—যেখানের সুখ সেইখানেই আছে—কিন্তু মন যা দেখিয়াছিল—যাহা দেখিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া আইল—তাহা আর পাইল না। যে মণির আলোকে মন ভুলিতেছে তাহারই ভিতরে কালফণি—আর যাহা চাক্ষুষ কালফণি তাহাই সঞ্জীবনী—স্বভাবের এই রীতি। স্বভাব মানুষকে স্বভাবতঃ সুন্দর করিয়াছে—কিছুরই অভাব রাখে নাই, অথচ কিছু অধিকও দেয় নাই। কিন্তু এই অহঙ্কারবিমূঢ় বা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদিগণ প্রকৃতি হইতে এত দূরে চলিয়া যায় যে, যে আহারের জন্য সামান্য কীটাণু হইতে বর্ব্বর পর্য্যন্ত ক্ষণকালও চিন্তাযুক্ত হয় না, সেই আহারের জন্যই এমন দুর্লভ মানবজীবনকে ব্যথিত করিতেছে। যে আহার প্রকৃতিভাণ্ডারে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, প্রকৃতি ছাড়িয়া কঠিন পরিশ্রমসাধ্য শিল্পের নিকট হইতে সেই আহার ভিক্ষা করিতে হইতেছে। হায়! কি মূর্খতা! ভোগের কি মোহিনী শক্তি। ব্রহ্মাণ্ড মনুষ্যের আহার, তথাপি মূঢ়গণ আহারের জন্য লালায়িত—আহারের আয়োজনে ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি বিসর্জ্জন দিতেছে। অহঙ্কারবিমূঢ়গণ যত বিলাস ও ভোগে রত হইতেছে, ততই তাহাদের আহার ও স্বাস্থ্য দূরে পড়িতেছে। এমন আরাধ্য জীবন কেবল মাত্র আহার ও স্বাস্থ্যের জন্যই উৎসর্গ করিতেছে। স্বভাব যখন ক্ষুধা দিয়াছে, তখন অন্নও প্রস্তুত করিয়া সম্মুখে ধরিয়াছে—যখন তৃষ্ণা দিয়াছে তখন জলও নিকটে রাখিয়াছে—খাইতে না জানিলেও খাওয়াইয়া দিবে। স্বভাব যথা নিয়মে জরায়ু মধ্যে শোণিত এবং

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই দুগ্ধ মুখে তুলিয়া দিতেছে। পশ্বাদিরা স্বভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং আহারের জন্য তিলার্দ্ধও চিন্তা করে না। যদি যেখানে রোগ, সেইখানেই ঔষধ—যেখানে হতাশ. সেইখানেই আশ্বাস—যেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সেইখানেই অন্ন-জল—যেখানে মরণ, সেইখানেই জীবন না থাকিত, তাহা হইলে ব্রহ্মবস্তু অদ্বৈত হইত .না—অর্থাৎ প্রকৃতির বা অসতের স্বতন্ত্র সত্বা থাকিলে, পুরুষ কখন পূর্ণ বা সৎ হইত না। কিন্তু অহঙ্কারিগণ কৃত্রিম স্বভাব নির্ম্মাণ করিতেছে—কৃত্রিম ভাবেই অবস্থান করিতেছে—সুতরাং আহারেরও কৃত্রিম উপায় উদ্ভব করিতে হইতেছে। অতএব অহঙ্কারীরা এক প্রকার বণিকজাতি। ব্যবসায় বাণিজ্যই ইহাদের উপজীবিকা,। সুতরাং নরহিংসাই ইহাদের জীবনের মূলমন্ত্র। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল ইহারাই অহঙ্কারবর্ত্মের পথিক বা দাম্ভিক বা মলিনতম ও রজোগুণপ্রবল মূঢ় বৈশ্য—কারণ শিল্প বা ভোগ্য বস্তুর কর্ষণ করাই ইহাদের কর্ম্ম। আবার দেখা যাইতেছে অধার্ম্মিক মধ্যে কতকগুলি লোক আছে, তাহারা ঘোর সংশয়ী। বুঝিয়াও বুঝে না—দেখিয়াও দেখে না। ইহাদের কণ্ঠে দুষ্ট সরস্বতী অন্তরে ঘোর কালিমা। ইহারা পাণ্ডিত্যাভিমানে পরিপূর্ণ, সুতরাং নিয়ত ক্ষুভিত হইতেছে। যেরূপ ছায়ায় দাঁড়াইলেও রৌদ্রতাপ বা আলোক অনুভব করা যায়, সেইরূপ এই সংশয়িগণ বিজ্ঞানের আভামাত্র প্রাপ্ত হইয়া মায়ামধ্যে অবস্থান করিতেছে। ইহারা নাস্তিকচূড়ামণি। ইহারা মুখে ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করে না, কিন্তু কার্য্যে সামান্য প্রকৃতির দাস হইয়া অনিত্য পদার্থ সকলের অস্তিত্ব স্বীকার করে—অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু সকল আছে—ইন্দ্রিয়গণ আছে—কিন্তু আমি নাই—আত্মা নাই—ঈশ্বর নাই—এইরূপ ভ্রান্তিজালে অথবা যেমন—কোন সময়ে দশজন লোক কোন দেশে যাত্রা করিতেছিল; পথিমধ্যে এক নদী পতিত হওয়ায় দশজনেই সেই নদী পার হইল; অনন্তর নদীর অপর পারে আসিয়া তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, "অহো! আমরা স্রোতে নামিয়াছিলাম, দেখা যাউক সকলে

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয়॥ ১৩॥

উঠিয়াছি কি না" এইরূপ কহিয়া সে সকলকে গণনা করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু আপনাকে ছাড়িয়া গণনা করায় যতবার গণিতে লাগিল নয় জন বই হইল না; এইরূপে একজনের অভাব হইতেছে দেখিয়া সে সকলকে এই কথা কহিল; তাহার কথায় সকলেই বিস্মিত হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সকলকে গণনা করিয়া, যেন যথার্থই এক জনের অভাব বোধ করিয়াছিল—সেইরূপ দশমন্যায়ে নিপতিত হয়। ইহারা বস্তুতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে পারে, কিন্তু সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারে না। সুতরাং ইহারা সমাজের তত অনিষ্টকর নহে, এমন কি অনেক সময়ে ইহারা সত্যকে গ্রহণ করুক্ বা না করুক্ সত্যের প্রশংসাও করে—অর্থাৎ সত্য ইহাদের বোধগম্য হয়, কিন্তু জ্ঞানগম্য বা ধার্য্য হয় না। অতএব ইহারাই সংশয়বর্ত্মের পথিক অথবা নাস্তিক বা মলিন-রজ-সত্ত্বপ্রধান মূঢ় ক্ষত্রিয়—কারণ ইহারা নিয়ত কূটতর্কে বিশ্বাস বা ধর্ম্মকে খণ্ডন করিতেছে। আবার দেখা যাইতেছে, কতকগুলি লোক আছে, তাহারা নিয়তই বিক্ষিপ্ত সুতরাং পদে পদে ভয় ও অনুতাপগ্রস্ত হইতেছে। ইহারা কোন কর্ম্মে সুখ বা তৃপ্তি পাইতেছে না। যেন স্বপ্নে ধর্ম্মের মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া, জাগরণে দেখিতে না পাইয়া ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিতেছে। ইহারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইলেও পাপকর্ম্মে চমকিত হয়। ইহারা অজ্ঞানবশত সুদূর পরিণাম দেখিতে না পাইয়া দুষ্কর্ম্ম করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্য অনুতাপ করিতে থাকে। ইহারা—"পরকাল ত দেখিতে পাই না—ইহকালই চাক্ষুষ, কিন্তু যদি পরকাল থাকে আমার দশা কি হইবে—অবশ্যই এই জগৎ কোন বিধির বিধি অনুসারে চলিতেছে—বোধ হয় আমিই অজ্ঞানবশত ধারণা করিতে অক্ষম"—এইরূপ ভাবনা করত নিয়ত কালযাপন করিতেছে। সুতরাং ইহারাই বিক্ষেপবর্ত্মের পথিক বা মলিন সত্ত্বগুণাধিক মূঢ় ব্রাহ্মণ এবং ইহাদিগকেই মুমুক্ষু কহে। জীব মুমুক্ষু অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে—অনিত্য ভোগ সুখে বিরক্তি না জন্মিলে,

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে স্বজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

কদাচ ধর্ম্মপথ দেখিতে পায় না। সুতরাং মুমুক্ষু অবস্থাই মায়ার চূড়ান্ত বাড় বা চরমসীমা এবং ব্রহ্মের বা ধর্ম্মপথের দ্বার, তা[illegible] আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জন্যই মুমুক্ষুদিগকে মূঢ় ব্রাহ্মণ [illegible] কারণ বিক্ষেপবর্ম্মের শেষ সীমা হইতেই মোক্ষমন্দিরের [illegible] উঠিয়াছে। অতএব ধার্ম্মিক মাত্রেই মুমুক্ষু অবস্থাপ্রাপ্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপে এক্ষণে দেখা গেল, অধার্ম্মিকমধ্যে গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে চারিবর্ণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে—অর্থাৎ তমোগুণাধিক মূঢ় শূদ্র বা বর্ব্বরগণ বিকৃতভূতপ্রিয়—তমরজগুণপ্রধান মূঢ়বৈশ্য বা দাম্ভিকগণ বিকৃতগুণপ্রিয়—রজসত্ত্বগুণাধিক মূঢ় ক্ষত্রিয় বা নাস্তিকগণ বিকৃতশক্তিপ্রিয় —এবং সত্ত্বগুণপ্রধান মূঢ় ব্রাহ্মণ বা মুমুক্ষুগণ বিকৃতজ্ঞানপ্রিয়। মূঢ় শূদ্র-দিগের ভূতবৃদ্ধিকর অনাচার ও অনিয়ম এবং কুসংস্কৃত দ্বিজগণের সেবা— মূঢ় বৈশ্যদিগের গুণবৃদ্ধিকর বিলাস ও ভোগ এবং ভূতাদির কৃত্রিম সংযোগে ভোগ্য বস্তুর সৃষ্টি—মূঢ় ক্ষত্রিয়দিগের শক্তিবৃদ্ধিকর ক্ষোভ ও অভিমান এবং বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ—এবং মূঢ় ব্রাহ্মণদিগের জ্ঞানবৃদ্ধিকর ভয় ও অনুতাপ এবং বিষয়ে বিতৃষ্ণাই—কর্ম্ম। অতএব জগতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সত্তা কে অস্বীকার করিতে পারে? কে না পুরুষরূপী সত্ত্ব, স্ত্রীরূপী রজঃ এবং ক্লীবরূপী তমোগুণ সকলপ্রকার প্রাণি-মধ্যেই জাজ্বল্যমান দেখিতেছে? কে না—১ পুরুষ; ১পুরুষ + ১ ইচ্ছা = ২ প্রকৃতি; ১ ইচ্ছা + ২ প্রকৃতি = ৩ গুণ; ২ প্রকৃতি + ৩ গুণ = ৫ ভূত; ২ প্রকৃতি + ৩ গুণ + ৫ ভূত = ১০ দিক্ বা জগৎ—এই মহাগণিতকে বীজ গণিত বলিয়া স্বীকার করিবে? অতএব সত্ত্বগুণ আদিভাগ, রজোগুণ মধ্যভাগ এবং তমোগুণ অন্তর্ভাগ। পরন্তু মধ্যস্থল কখন নিরালম্বভাবে থাকিতে পারে না, একদিকে আদিকে এবং অন্যদিকে অন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই হেতু তিন গুণই চারি বর্ণে বিভক্ত—অর্থাৎ সত্ত্ব আদি বা শ্রেষ্ঠ হেতু শান্ত—রজঃ মধ্য হেতু একদিকে সত্ত্বকে আর অপরদিকে তমকে আশ্রয় করত সুখদুঃখময় বা ঘোর—এবং তমঃ অন্ত

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

বা নিকৃষ্ট হেতু মূঢ়। এইরূপে যোগপথেও গুণ ও কর্ম্মানুসারে চারি বর্ণের মানব নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। অর্থাৎ ধার্ম্মিকগণের মধ্যেও এই চতুর্ব্বিধ ভেদ লক্ষিত হয়। কতকগুলি লোক এরূপ আছে যে, তাহারা—ধর্ম্ম কি পদার্থ—ঈশ্বর কিরূপ—এই সকল গুহ্য তত্ত্ব অবধারণ করিতে অক্ষম হইলেও, কেবল ধর্ম্মেরই প্রশংসা করে—ধর্ম্মেরই আদর করত—ধর্ম্মেরই মহিমা কীর্ত্তনে—ধার্ম্মিক সহবাসেই কালযাপন করিতে ভালবাসে। ইহারা ধর্ম্মের উপদেশপ্রার্থী হইয়া, কোন বিষয়েই আত্মগৌরব দেখায় না। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে যত পারুক বা না পারুক, যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহার দাসত্বে নিযুক্ত হয়—এমন কি ধর্ম্মের নামে গদগদ এবং কর্ম্মে পুলকিত হয়। ইহারাই যোগপথের প্রথম পথিক বা ভক্তিমার্গাবলম্বী। ইহাদিগকে উজ্জ্বল তমোগুণপ্রধান যোগী শূদ্র কহে, এবং যোগের বা ধর্ম্মের বা যোগী জনের বা দ্বিজগণের বা ব্রহ্মবিদ্ সাধুগণের অর্থাৎ সাকার ব্রহ্মের পরিচর্য্যাই ইহাদিগের কর্ম্ম। এবং মহাজন পন্থানুসারে বা গুরূপদেশে সাকার ব্রহ্মের ভজনা করাই ইহাদিগের ধর্ম্ম। অতএব ভক্তগণ স্বাধীনভাবে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, ধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত দাঁড়াইতে পারে না এবং গুরুর সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। ধর্ম্মের কর্ম্মই সংযম, সুতরাং যোগপথের দ্বারই সংযম। অতএব যম ও নিয়মই ভক্তিযোগের অঙ্গ। ভক্তগণ আপনাকে প্রকৃতি মনে করিয়া ঈশ্বরকে পুরুষজ্ঞানে, শান্ত্য, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাবে স্বামীর ন্যায় সেবা করিয়া থাকে। যেমন কোন স্থলে মণিপ্রভা এবং উজ্জ্বল দীপশিখার আলোক একত্রিত হইলে কোন দুই ব্যক্তি উভয়কেই দীপ জ্ঞান করিয়া, যদি কেহ মণির নিকটে, আর কেহ দীপের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যদিও উভয়েই ভ্রান্ত—তথাপি একজন সৌভাগ্যক্রমে মণিরদিকেই আসিয়াছে, আর অপর জন দুর্ভাগ্যবশত দীপের নিকট গিয়াছে। সেইরূপ ভক্তগণ মূঢ়শূদ্রগণের ন্যায় তমোগুণাধিক হইলেও, যথার্থ পথে মণির দিকেই চলিতেছে। জগতে যত প্রকার খণ্ড বা শাখাধর্ম্ম

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

আছে তৎসমুদয়ই এই যম ও নিয়মবিশিষ্ট ভক্তিমার্গের অন্তর্গত। মায়াচ্ছন্ন প্রমত্ত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে খণ্ডাবতারগণ যে সকল ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন তৎসমুদয়ই এই প্রেমময় ভক্তিমার্গের যান। প্রচারসিদ্ধ ধর্ম্মমাত্রই ভক্তিযোগ—কারণ প্রচার অর্থেই নাম—নামেরই কীর্ত্তন—নামেরই স্মরণ—নামেরই উদ্দেশে সব। নাম ভৌতিক পদার্থ—শূন্যের গুণ। যেহেতু মোহান্ধজীবগণ একেবারে ব্রহ্মবস্তু ধারণা করিতে পারিবে না, সেইজন্য নামের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া, তারকব্রহ্ম নামেরই গুণানুকীর্ত্তন করাইতে অগ্রে শিখাইবার জন্য, অথবা পরোক্ষজ্ঞান না হইলে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে না, সেইজন্য আহারাদির সংযম এবং ব্রত উপবাসাদি নিয়মদ্বারা ভীষণ দস্যুদিগকে নাড়ীশোধন পূর্ব্বক ক্রমশ সূক্ষ্মতর বিষয় সকল ধারণা করিতে পারদর্শী করিবার নিমিত্তই মহাত্মাগণের আবির্ভাব। যেরূপ একমাত্র প্রবল প্রভঞ্জনপ্রবাহ সুদূরবিস্তৃত জলদপটলকে অপসারিত করিয়া থাকে—যেরূপ একমাত্র প্রভাকর স্বীয় কিরণপ্রভাবে জগতের অন্ধকার বিদূরিত করেন—সেইরূপ এক এক সময়ে, এক এক দেশে, এক এক অবতার অবতীর্ণ হইয়া মোহাচ্ছন্ন জীবগণেরই মোহ দূর করিবার জন্য এক এক প্রকার যোগযানের আবিষ্কার করিয়া থাকেন। যেরূপ যানারোহীর অন্য যানের প্রয়োজন হয় না—দিবসে দীপালোকের আবশ্যক নাই—সেইরূপ প্রচারিত ধর্ম্ম বা শাখাধর্ম্ম যোগারূঢ় দ্বিজগণের জন্য নয়, কেবল মুমুক্ষুদিগকে যোগারূঢ় করিবার জন্য। যেহেতু ভক্তি-মার্গই যোগের প্রথম পথ, সুতরাং শাখাধর্ম্ম সকল যে যোগী শূদ্রদিগের জন্য উদ্ভূত হইয়াছে তাহাতে কে সন্দেহ করিবে? অতএব প্রচারসিদ্ধ ধর্ম্ম মাত্রেই এই ভক্তিমার্গের অন্তর্গত এবং শাখাধর্ম্মাবলম্বিগণই ভক্ত বা যোগী শূদ্র বা সংযমী ও নিয়মী। ইহাদের সংস্কার নাই, কারণ ইহারা জ্ঞানকাণ্ড বা বেদরহস্য বা অনুমেয় ব্যাপার অনুধাবন করিতে অসমর্থ। সুতরাং ইহারা ব্রহ্মাখ্য বীজ ওঁকারের অনধিকারী। এ দিকেও দেখা

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয়॥ ১৩॥

যাইতেছে, আহারাদির সংযম এবং ব্রত উপবাসাদি নিয়ম দ্বারা নাড়ী ও ধাতু শুদ্ধ না হইলে, দীর্ঘ মাত্রায় রীতিমত স্বর যোজনা করিয়া প্রবাহিত স্বরে সমতালে ওঁকার উচ্চারণ করিতে পারদর্শী হওয়া যায় না। অতএব তমোগুণাবলম্বী যোগী শূদ্রগণ যম ও নিয়ম দ্বারা নাড়ীশুদ্ধি করিলে ইহ জন্মেই হউক, আর জন্ম জন্মান্তরেই হউক্, সংস্কারের যোগ্য হয়। যোগী শূদ্রগণ কদাচ হেয় বা ভিন্ন জাতির জীব নহে—অর্থাৎ যে অবধি ব্রাহ্মণ সেই অবধিই শূদ্র—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারিবর্ণ এক অবয়বেরই অঙ্গ বিশেষ। অতএব এই শূদ্রগণ অসংস্কৃত হইলেও যোগপথের পথিক বা যোগী তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যোগী শূদ্র বা ভক্তগণ—ঈশ্বর কি?—মায়া কি?—এই তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে না বটে, কিন্তু ঈশ্বরকে ঈশ্বররূপে মানিতে পারে, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে এবং গুরুর চরণসেবাই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতে পারে। ঈশ্বর কি পদার্থ, গুরু কি পদার্থ, তাহা ধারণা করিতে পারে না, কিন্তু রটনা করিতে পারে—মনন করিতে পারে না, কিন্তু শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতে পারে—ধ্যান করিতে পারে না, কিন্তু উপাসনা করিতে পারে। সেই জন্য ইহারা যোগী হইয়াও সংস্কৃত বা দ্বিজ নহে। সন্তান যেরূপ যতদিন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে ততদিন জন্মধারণ করিলেও জাত নহে, সেইরূপ যোগী শূদ্রগণ সংস্কারপথে পদার্পণ করিলেও সংস্কৃত বা দ্বিজ নহে। যতদিন না যম ও নিয়মরূপ অন্ধ-তপস্যা হইতে বহিষ্কৃত হইবে ততদিন কি প্রকারে দ্বিতীয় জন্ম ধারণ করিবে? পুনশ্চ দেখা যাইতেছে যেরূপ ভক্তিমার্গাশ্রয়ী শূদ্রগণ জড় বা সাকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত, সেইরূপ কতকগুলি লোক আছে, তাহারা জড় অতিক্রম করত গুণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম-বস্তু গুণচক্ষে দেখিতে পারে—অর্থাৎ এই গুণময় জগৎ হইতে গুণ আকর্ষণ বা গুণমধ্যে ব্রহ্মের মহিমা নিরীক্ষণ বা গুণকে স্বতন্ত্ররূপে অনুভব বা আকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাকারের নিরাকার কাণ্ড

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয়॥ ১৩॥

অবধারণ করিতে পারে। ইহারা স্থির আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-বেগ সংযম করত গুণমধ্যে ব্রহ্মের মাহাত্ম্য বা গুণগ্রাম অবগত হয়। একমনে স্থির হইয়া কোন পদার্থের গুণগ্রাম অনুধাবন করিবার সময়, ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসকলকে বাহ্য বিষয় হইতে সঙ্কুচিত করিয়া, মন চঞ্চলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তরে অন্তরে কার্য্য করিতে থাকে, সুতরাং প্রাণ বা শ্বাসবায়ু স্বভাবতই মৃদু হইয়া আসে, অতএব আসন ও প্রাণায়ামই ইহাদের লক্ষণ। যেরূপ ভক্ত শূদ্রগণের একমাত্র দ্বিজসেবাই কর্ম্ম, সেইরূপ ইহাদের গুরুপূজন ও অভ্যাসই কর্ম্ম। অতএব ইহারাই যোগমার্গের পথিক এবং ইহাদিগকেই হঠযোগী বা উজ্জ্বল তমোরজোধিক যোগী বৈশ্য কহে। ইহাদের গুণানুকর্ষণই কর্ম্ম এবং গুণের পোষকতাই ধর্ম্ম। ইহারা স্থূল ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি সংযম পূর্ব্বক নিয়ত গুণব্রহ্ম তত্ত্বে তত্ত্বত বা গুণনির্ণয়ে নিরত থাকে। ভৌতিক বা জড় পদার্থসকল চক্ষুরাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচর,—কিন্তু গুণগ্রাম সূক্ষ্ম অনুমেয় পদার্থ, সুতরাং চাক্ষুষ হইবার নয়। অতএব যোগমার্গই অনুমেয় জগৎ বা জ্ঞানকাণ্ডের প্রারম্ভ। যেরূপ স্বাধীন কীট আপনারই নালে গুটী প্রস্তুত পূর্ব্বক অধীন হইয়া, পুনরায় আপনিই সেই গুটী কাটিয়া স্বাধীন প্রজাপতিরূপে প্রকাশিত হইলে, তাহার সেই কীটজন্ম প্রথম জন্ম এবং এই প্রজাপতি জন্ম দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়—যেরূপ জরায়ুমধ্যস্থ শুক্রবিন্দু গর্ভে একপ্রকার পিণ্ডজন্ম এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া জীবরূপে দ্বিতীয় জন্ম ধারণ করে—যেরূপ সেই শিশু আবার প্রমত্ত যৌবনে উন্মত্ত হইয়া কৌমার জন্মকে ঘোর অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মনে করিয়া, যৌবনকে দ্বিতীয় বা সংস্কৃত জন্ম জ্ঞান করে—আবার যেরূপ জরায় সেই যুবা যৌবনকে ভীষণ ভাবিয়া, যে ধরাকে তখন সরা জ্ঞান হইত, সেই ধরায় এক্ষণে আপনাকে সেই সরার রেণুর রেণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র জ্ঞান করত দ্বিতীয় জন্ম ধারণ করে—সেইরূপ স্থূল অতিক্রম করিয়া জীব সূক্ষ্ম অনুধাবন করিতে

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

সমর্থ হইলে, প্রাকৃতিক বা মায়া জন্ম অতিক্রম করত যোগজন্ম বা পরমাত্ম জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে—কারণ জন্ম ধারণ দেহীর অবস্থান্তর বই আর কিছুই নয়। যে জীব মায়া জন্মে অহংমদে মত্ত হইয়া চারিদিকে "আমার" "আমার" করিয়া ছুটিতে ছিল, সেই জীব এক্ষণে সংস্কৃত জন্মে "আমার" ছাড়িয়া "সকলই তোমার"—বলিয়া কামবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক স্থির হইল। যে জীব পূর্ব্বজন্মে ভোগ্যবস্তুসকলে "আমার" গণ্ডি দিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া সীমাবৃদ্ধির জন্য লালায়িত হইতেছিল, সেই জীব এক্ষণে "আমার" গণ্ডি মুছিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভোগ করিতে লাগিল। যে জীব পূর্ব্ব জন্মে কামে উন্মত্ত হইয়া যে সকল অকিঞ্চিৎকর ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয় সুখের জন্য মুগ্ধ হইয়া ছুটিতেছিল, সেই জীব এক্ষণে—"আমি কি মূঢ়! কি ভ্রান্ত! অনিত্য সুখের জন্য এমন নিত্য আত্মাকে অনর্থক ব্যস্ত করিতেছিলাম—এমন পরমানন্দ ছাড়িয়া কোন্ নিরানন্দ স্থানে আনন্দ অন্বেষণ করিতেছিলাম?"—এইরূপ কহিয়া শান্ত হইতে লাগিল। যে জীব পূর্ব্বজন্মে যে বস্তুকে যে ভাবে দেখিতেছিল, সেই জীব এক্ষণে সেই বস্তুকে নূতন ভাবে দেখিতে লাগিল এবং কি যেন অনির্ব্বচনীয় ঐশীভাবে ভোর হইয়া—যেন অমাবস্যায় পূর্ণিমার চন্দ্রালোক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন সকল পদার্থে এক এক প্রকার বিভিন্ন রূপ দেখিতেছিল এক্ষণে এক পদার্থে সকল পদার্থ এবং সকল পদার্থে এক পদার্থ অভিন্নরূপে দেখিতে লাগিল। অতএব জ্ঞান বা নিরাকার ব্রহ্মপথের পথিক মাত্রেই দ্বিজ। পুনশ্চ দেখা যাইতেছে কতকগুলি লোক আছে যে, তাহারা জড়গ্রাম ও গুণগ্রাম অতিক্রম করত প্রকৃতি তত্ত্ব নির্ণয়ে নিপুণ। ইহারা শক্তিমধ্যে ব্রহ্মবস্তু নিরীক্ষণ করিতেছে—হংসের ন্যায় জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে শুদ্ধ দুগ্ধ চুম্বন করিতেছে—এই সদসদাত্মক জগত হইতে বিজ্ঞানবলে সৎ ও অসৎকে পৃথক করিয়া উভয়ের পর্য্যালোচনা করিতেছে—অণিমাপ্রভাবে অণুর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পরমাণুতত্ত্ব অনুধাবন করিতেছে—লঘিমাবলে বায়ু অপেক্ষাও লঘু

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয়॥ ১৩॥

হইয়া নভোমার্গে উড্ডীন হইয়া জ্যোতিষ্কতত্ত্ব অবলোকন করিতেছে—প্রাপ্তিপ্রভাবে যথা তথা গমন পূর্ব্বক দুর্গম পদার্থেরও তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছে—প্রাকাম্যবলে ভোগ্যবস্তু সকলের গুণমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ভোগেচ্ছাতত্ত্ব অনুশীলন করিতেছে—মহিমাপ্রভাবে সকল প্রকার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণিস্বভাবতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতেছে—ঐশিতা বলে কার্য্য কারণ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সৃষ্টিতত্ত্ব অনুধাবন করিতেছে—বশিতা বলে আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যক্ষ করত সকলকেই আয়ত্তাধীনে আনিতেছে—কামাবশয়িত্বপ্রভাবে সকল প্রকার মনোরথ পূর্ণ করিতে নিযুক্ত হইতেছে। অতএব ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মানস সংযমই ইহাদের লক্ষণ—কারণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক মনকে স্থির না করিলে পদার্থ সকলের বিশেষ জ্ঞান লাভ হয় না এবং এক বস্তুর অনবরত চিন্তাব্যতীত মন স্থির হয় না। সুতরাং প্রত্যাহার ও ধ্যান ইহাদের অঙ্গ। ইহাদিগকে বিজ্ঞানী বা সাংখ্যযোগী কহে, কারণ ইহারা পদার্থ সকল কোন্ কোন্ উপাদানে এবং কি ব্যবহারের নিমিত্তই বা উদ্ভূত, তাহার সংখ্যা নির্ণয়ে নিরত। ইহারা বিজ্ঞানমার্গের পথিক বা বিবেকী বা উজ্জ্বল রজ ও সত্ত্বগুণ প্রধান যোগীক্ষত্রিয়—কারণ ইহাদের সংযুক্ত প্রকৃতিপুরুষকে বিযুক্ত করাই কর্ম্ম এবং উভয়ের তত্ত্ব অবধারণ করত একমাত্র পুরুষে যুক্ত হইতে যাওয়াই ধর্ম্ম। পুনশ্চ দেখা যাইতেছে, কতকগুলি লোক আছে তাহারা যেন স্বতই শান্ত—কর্ম্মে যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে চায় না—যেন কি অমৃত পান করিয়া অনন্তকালের জন্য অনন্ত তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে—যেন সকল পদার্থে কি এক পদার্থ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক একমাত্র তাহাকেই আশ্রয় করত এমন ভোগমন্দিররূপ দেহকেও দূরে নিক্ষেপ করিতেছে—যেন প্রাণে প্রাণে কি সুন্দর লহরী শ্রবণ করিতেছে—মনে মনে কি অনির্ব্বচনীয় পদার্থের মনন করত অনন্ত আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেছে—যেন বিচারে উত্তীর্ণ হইয়া ভবধাম হইতে মুক্ত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চল করত পরমধামে অবস্থান করিতেছ—যেন প্রকৃতিদেবী অষ্টমণি

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

খচিত অষ্টৈশ্বর্য্য মুকুট বারম্বার তাহার মস্তকে স্থাপন করিতেছেন আর সে তাহাকেও তুচ্ছ করিয়া দিগম্বর হইতেছে—যেন কায়মন ও চিত্তকে অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মে লীন করিয়া ব্রহ্মভাবে ভোর হওত বাহ্য সংস্পর্শ রহিত হইয়া নিরবয়ব বিন্দুরূপে অবস্থান করিতেছ। অতএব ইহাদের ধারণা ও সমাধিই অঙ্গ—কারণ যেরূপ মৃণ্ময় পাত্রের স্বরূপের অগ্নিই কারণ; কিন্তু সেই কারণ ও কার্য্য অর্থাৎ আগ্নিও পাত্র একত্র হইলে কার্য্যরূপী পাত্রের ধ্বংস হইয়া কারণরূপী অগ্নিই বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ এই ভব কটাহের কারণরূপ ব্রহ্মের ধারণা হইলে কার্য্যরূপী ক্রিয়াশক্তির অন্তর্ধান হইয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মবস্তু প্রকাশমান থাকে অর্থাৎ বিবেকী জীব ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিলে ব্রহ্মেই অবস্থান পূর্ব্বক সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব ইহারাই জ্ঞানমার্গের পথিক বা পরমহংস বা উজ্জ্বল সত্ত্বগুণাধিক যোগী ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মযোগী। এইরূপে এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে বর্ণধর্ম্ম স্বভাবসিদ্ধ। এমন কি এই জাতিধর্ম্ম প্রত্যেক প্রাণীতেও দেখা যায়। সুতরাং একটী মনুষ্যেও ইহার চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সদ্যজাত শিশুর অবস্থা লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সে ঘোর অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। তাহার ইন্দ্রিয়গণ ও মনোমাত্র বিকশিত হইয়াছে—অর্থাৎ সেই মানব কুসুমের পঞ্চকলির মধ্যে কেবল অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষত্রয় প্রস্ফুটিত হইয়াছে; বিজ্ঞান, ও জ্ঞান কলি তখনও মুকুলিত হয় নাই। সে প্রাকৃতিক অবস্থাপন্ন, সুতরাং একমাত্র ইন্দ্রিয়সেবাই—জানে। অতএব সে এখন শূদ্র। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, যখন তাহার বিবেকোদয় বা বিজ্ঞানময় কোষ মুকুলিত হইতে থাকে, তখন তাহার ভাল, মন্দ, আমি, তুমি, আপন, পর ইত্যাদিরূপ সংস্কার হইতে থাকে। এতাবৎকাল যেন শৈশবরূপ এক জন্মই ঘোর অজ্ঞানে কাটিয়া গিয়াছে, এক্ষণে সে যেন অন্ধকার হইতে আলোক প্রাপ্ত বা দ্বিজভাবাপন্ন হইল। তাহার কার্য্য—কেবল শরীরের, মনের ও বুদ্ধির পুষ্টিসাধন বা কর্ষণ। অতএব সে এখন বৈশ্য। এইরূপে

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

কিছুকাল আরও গত হইলে, তাহার বিজ্ঞান শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হইল। সে জ্ঞানের আভা দেখিতে পাইল। এক্ষণে তাহার কর্ম্ম—প্রকৃতিজ পদার্থ সকলের তত্ত্বানুসন্ধান বা দর্শন, অথবা ধীশক্তির সম্যক্ পরিচালনা। অতএব সে এক্ষণে ক্ষত্রিয়। অবশেষে যখন তাহার বুদ্ধি বহু দর্শনে স্থির হইয়া নিশ্চলভাব ধারণ করিল, তখন তাহার জ্ঞানময়কোষ অল্পে অল্পে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। যে সকল বিষয় সে এত কাল কেবলমাত্র দেখিতেছিল, এখন সেই সকলের জ্ঞান হইতে লাগিল। যে সকল বিষয় এতকাল মনে স্থান পায় নাই—মন যাহা বুঝিয়াও বুঝে নাই—বুঝাইলেও কাণ দেয় নাই— যে সকল বিষয়ে নিকৃষ্ট হইলেও উৎকৃষ্ট—মূর্খ হইলেও জ্ঞানী—না জানিলেও সর্ব্বজ্ঞ—ইত্যাদিরূপ আত্মাভিমানে, যে বুদ্ধি উন্মত্ত বা অস্থির ছিল; এক্ষণে সেই বুদ্ধি সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া স্থির হইল—আপনাকে আপনি তৃণাপেক্ষাও ক্ষুদ্র মনে করিল—সকল বুঝিয়াও কিছুই বুঝি না বা বুঝিবার বিস্তর আছে, এইরূপ ভাবিল। তাহার কর্ম্ম—পরিণামদর্শিতা বা পদার্থের সারমর্ম্ম অবগত হওয়া। অতএব সে এক্ষণে ব্রাহ্মণ। এইরূপে যখন, যাহা বাহিরে আছে তাহা অন্তরেও আছে এবং যাহা ভিন্ন ভিন্ন আধারে আছে, তাহা একাধারেও আছে; তখন এই চারি বর্ণ বা জাতি প্রকৃতিজাত, নিত্য এবং অক্ষয়। এবং যখন আছে, তখন সৃষ্টির প্রথম হইতেই আছে। সেই নিমিত্তই আর্য্য ঋষিগণ এই নিত্য জাতিধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য আর্য্য সমাজে, আদি ব্রাহ্মণ, আদি ক্ষত্রিয়, আদি বৈশ্য ও আদি শূদ্রের কুল রক্ষা করত, বর্ণধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছেন। যেরূপ নিরাকার গুণ সাকার ভূতাশ্রয়ে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ নিরাকার বর্ণধর্ম্ম সাকার কুলধর্ম্ম কর্তৃক পরিরক্ষিত হয়। সেই জন্যই ঋষিগণ কুলধর্ম্মকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেহেতু ধর্ম্ম অর্থই ধারণা অর্থাৎ সম্বরণ বা ধৈর্য্য; সুতরাং সঙ্কোচ। সঙ্কুচিত না হইলেই বিস্তৃত হইতে হইবে, কোন বিষয়ে বা কোন স্থানে স্থির থাকিবার যো নাই—সুতরাং তৃপ্তিও

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

নাই ; কারণ যেরূপ—পাইবার ইচ্ছা থাকিলে, পাওয়া হয় নাই—খাইবার ইচ্ছা থাকিলে, খাওয়া হয় নাই—সেইরূপ ভোগের ইচ্ছা থাকিলও কর্ম্মভোগের অবসান হয় নাই। যেরূপ ব্যাধ মৃগকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিলে মৃগ ব্যাধ অপেক্ষা অধিকতর শক্তি প্রয়োগ না করিলে, বিপরীতগামী হওয়া দূরে থাকুক, সেই স্থানেই স্থির থাকিতে অক্ষম হইয়া ক্রমশ ব্যাধমুখেই অগ্রসর হইয়া থাকে ; সেইরূপ এ সংসারে কাল কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সকলকেই কর্ম্মচক্রে চূর্ণীকৃত বা বিস্তৃত করত হরণ করিতেছে, সুতরাং সংযম বা ধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত এক বিষয়ে বা এক স্থানে স্থির থাকিবার যো নাই। ত্যাগের দিকে অগ্রসর হইলে তবে এ জীবনকে ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ভোগ করা যায়, নতুবা ভোগের দিকে ধাবমান হইলে প্রকৃতির ভোগ্য হইয়া চিন্তা, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি অসংখ্য রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। ইন্দ্রিয়নিগ্রহের সাধন করিলে, তবে ইন্দ্রিয়গণ স্থির হইয়া বিষয় সকলের তত্ত্বমধু পান করিবে, নতুবা ইন্দ্রিয়ারামে নিযুক্ত থাকিলে, প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ প্রশ্রয় পাইয়া অস্থিরভাবে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণ পূর্ব্বক কোন বিষয়ই ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না, বরং বিষয় সকল তাহাকে ভোগ করিবে। অতএব সংযম ব্যতীত কুলধর্ম্ম রক্ষা হয় না। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, মনঃসংযম এবং বুদ্ধি স্থির করত জ্ঞানের সার্থকতা না করিলে, এ ভবগৃহে গৃহী হওয়া যায় না, কেবল পথিক হইয়া ভ্রমণ করিতে হয়, সুতরাং কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়। অতএব কুলরক্ষাই ধর্ম্মের অবয়ব। বৃক্ষের ফল যেরূপ বৃক্ষের পরিচয় প্রদান করে, কুলও সেইরূপ ধর্ম্মের পরিচয় দিয়া থাকে—অর্থাৎ বংশ দেখিয়াই প্রমাণ হয়, সেই জাতি সঙ্কুচিত হইতেছে, কি বিস্তৃত হইতেছে—সংযম বা ধর্ম্মের দিকে আসিতেছে, কি যদৃচ্ছাচার বা অধর্ম্মের দিকে চলিতেছে। কুলধর্ম্মও জাতিধর্ম্মের ন্যায় নিত্য, কারণ পদার্থ মাত্রই এক মূর্ত্তি হইতে অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। যে মূর্ত্তি যাইতেছে, তাহা আর হইতেছে না বটে, কিন্তু তদ্রূপ আবার একটী বা সমধিক মূর্ত্তির উদয়

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

হইতেছে। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যের তিরোভাব হইলেও মনুষ্যকুলের কখন লোপ হইবে না, সুতরাং কুলরক্ষাও ধর্ম্মের অঙ্গ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যদিও এই পৃথিবীতে কখন কোন জাতীয় প্রাণীর কুলের তিরোভাব দেখা যায়, তথাপি তাহার কুলের লোপ হয় নাই। সেই জাতীয় প্রাণী এক পৃথিবী না হয় অন্য পৃথিবীতে বংশ রক্ষা করিতেছে। বলিতে কি, এই জগৎ বংশাবলীরূপে একমাত্র চৈতন্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কুলধর্ম্ম রক্ষিত হইলে এই চারিবর্ণ চারিবর্ণেই থাকিবে, কিন্তু ভ্রষ্ট হইলে অসংখ্য বর্ণে বিস্ফারিত হইয়া বিকৃত মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সংসারকলস কলুষিত করিতে থাকিবে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া যোগবলে বলিয়ান্ মহর্ষিগণ মূঢ় জীবগণকে ভবপারাবার পার করিবার জন্য অপূর্ব্ব আশ্রম ধর্ম্মসেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদুপর দিয়া জীবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ চারি অবস্থাভেদে চারি প্রকার সাধন বা চতুরাশ্রম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বাল্যাবস্থায় জীব যখন ঘোর অজ্ঞানতিমিরে তমোগুণাধিক শূদ্রভাবাপন্ন থাকে, তখন জড় দেহের পরিচালনারূপ সেবাই তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং ইন্দ্রিয়গুণের সুবিস্তার না হওয়ায়, আরাম ও নিগ্রহ উভয় কর্ম্মই সমান। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের ভৌতিক পরিরক্ষণ কর্ম্মে নিযুক্ত না থাকিয়া অনাচার ও অনিয়মে এমন পবিত্র দেহকে কলুষিত না করিয়া—দেহ-সংযমরূপ ব্রহ্মের আচারে ব্যাপৃত থাকিতে—ব্রহ্মচর্য্য নামক যম ও নিয়ম বিশিষ্ট প্রথম আশ্রম। যৌবনে মনোবৃত্তি সকল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, তমঃ ও রজো গুণের আধিক্য বশত ইন্দ্রিয়গণ পদার্থের গুণানুকর্ষণে সমর্থ হইলে, জীব যখন বৈশ্য ভাবাপন্ন থাকে, তখন ইন্দ্রিয়াদির সহায়ে ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন করত উপভোগ বা ইন্দ্রিয়ের আরাম করাই তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং বুদ্ধিবৃত্তির সুবিকাশ না হওয়ায়, ইন্দ্রিয়ের আরামে, জীব রক্ষাই হউক বা পতনই হউক, উভয়কেই অন্ধের ন্যায় সমান দেখে। সুতরাং প্রাণের আরামে অহংমদে মত্ত হইয়া কামবশে অসংখ্য বিষয়ে অস্থিরভাবে বিচরণ করত বিষয়ের প্রকৃত স্বাদ ভোগে

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয় ॥ ১৩ ॥

বঞ্চিত না হইয়া—বিলাস ও ভোগের চরণে এমন ভোগমন্দিরকে উৎসর্গ না করিয়া—প্রাণ সংযমরূপ ব্রহ্মের গৃহে গৃহী হইয়া স্থায়ী হইতে—প্রকৃতি-পুরুষ-পালনকারী আতিথেয় রূপ ব্রহ্মের সৎকার করিতে—আসন ও প্রাণায়ামযুক্ত গার্হস্থ্য নামক দ্বিতীয় আশ্রম। প্রৌঢ়াবস্থায় ধীশক্তির পূর্ণ বিকাশ হেতু, রজ ও সত্ত্বগুণাধিক্য বশত, যৌবনে গুণতত্ত্ব বাণিজ্য করত মনোভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া, এক্ষণে বিবেকরূপ রাজাসনে সমাসীন হইয়া জীব যখন ক্ষত্রিয় গুণাপন্ন থাকে, তখন নির্ভীকচিত্তে সদসৎ বিচার করাই তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং বুদ্ধির পরিপাক হইয়া জ্ঞানের উদয় না হওয়ায়, কি সৎ কি অসৎ উভয়েরই পর্য্যালোচনা করা তাহার পক্ষে সমান। সুতরাং ভোগতত্ত্ব অনুশীলন না করিয়া, প্রকৃতিতত্ত্ববিচারে নিযুক্ত হইতে—ক্ষোভ ও অভিমানে স্ফীত হইয়া "চিন্তাচিতায়" এমন শীতল জীবনকে দগ্ধ না করিয়া, ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযম পূর্ব্বক বিষয়নগর হইতে নির্জ্জন বনে গমন করত, প্রকৃতিরাজ্যের রাজা হইয়া, শান্তি-মুকুট শিরে ধারণ করত, অষ্টৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে—প্রত্যাহার ও ধ্যানবিশিষ্ট বানপ্রস্থ নামক তৃতীয় আশ্রম। বার্দ্ধক্যে জ্ঞানের উদয় হওয়ায় সত্ত্বগুণের আধিক্যহেতু বিচার করিতে করিতে স্থির হইয়া—না পাইয়া, না পাইয়া—পাইবার আশা ছাড়িয়া, জীব যখন ব্রাহ্মণ গুণাপন্ন থাকে, তখন জরামরণাদি পরিণাম দর্শন এবং গত বিষয়ের অনুশোচনাই তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং বিষয়চিন্তাই হউক্, আর ব্রহ্মচিন্তাই হউক্, উভয় চিন্তাই তাহার সমান। সুতরাং ভয় ও অনুতাপে সন্তপ্ত না হইয়া, পরমাত্মতত্ত্বে তত্ত্বজ্ঞ হইতে—বিজ্ঞানসংযম পূর্ব্বক রিক্ত হস্তে কামরূপী জন্ম-বীজান্ন সমূলে ভক্ষণ করিয়া, অন্নের দেহের জন্য অন্নপূর্ণার নিকট অন্ন ভিক্ষা করিতে—ধারণা ও সমাধি বিশিষ্ট ভৈক্ষ্য নামক চতুর্থ আশ্রম। সুতরাং আচার বা সংযমই আর্য্য বা সনাতন বা যোগ ধর্ম্মের ভিত্তি বিচার বা বিজ্ঞানই সোপান এবং জ্ঞান বা ব্রহ্মনির্ব্বাণই চরম চূড়া। আর্য্যধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক নহে, ইহা প্রাকৃত বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অজ্ঞ

গুণ-কর্ম্ম-ভাগে সৃজি বর্ণ চতুষ্টয়।
কর্ত্তা তার, মোরে জেনো অকর্ত্তা অব্যয়॥ ১৩॥
কর্ম্ম নাহি লিপ্ত করে, ফলে স্পৃহা নয়।
হেন মোরে জানে, সে না কর্ম্মে বদ্ধ হয়॥ ১৪॥
হেন জানি করে কর্ম্ম প্রাগ্মুমুক্ষু যত।
তবে তুমি কর কর্ম্ম পূর্ব্বতন কৃত॥ ১৫॥
কি কর্ম্ম, অকর্ম্ম কিবা, মুগ্ধ কবিগণ।
কহি কর্ম্ম, জানি হবে অশুভ খণ্ডন॥ ১৬॥

লোকেরাই ইহা'ক হিন্দুধর্ম্ম নামে অনার্য্য ভাষায় সংজ্ঞিত করিয়া থাকে। এইহেতু বেদ স্বভাবজাত এবং স্বভাবব্যাপ্ত, অর্থাৎ প্রকৃতিপুত্র ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত—কদাচ মনুষ্যকৃত নহে। কারণ গুণময় পদার্থ ভিন্ন জ্ঞানের মহিমা বা গুণ প্রত্যক্ষ করত প্রকাশ করা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব হে অর্জ্জুন! যদিও আমা হইতে বা জ্ঞানরূপী পরব্রহ্ম হইতেই প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতেই গুণ, গুণ হইতেই ভূত ইত্যাদি পরম্পরারূপে সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে বটে, তথাচ আমাকে অকর্ত্তা বা নিষ্ক্রিয় বলিয়া জানিও, যেহেতু এক ভাব হইতে ভাবান্তরে গমনের নামই ক্রিয়া, কিন্তু আমি সেই ভাবান্তর রহিত—অতএব নিষ্ক্রিয় ও অক্ষয়॥ ১৩॥ সুতরাং কর্ম্ম আমাকে লিপ্ত করিতে বা কর্ম্মফল আমাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। অতএব হে অর্জ্জুন! যে আমাকে এইরূপে নির্গুণভাবে অবগত হয়, সে কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে॥ ১৪॥ হে অর্জ্জুন! আমাকে এইরূপে জ্ঞাত হইয়া জনকাদি পূর্ব্বতন মোক্ষার্থিগণ কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, অতএব তুমিও সেই পূর্ব্বতন মহাত্মাগণকৃত কর্ম্ম সকল আচরণ কর॥ ১৫॥ হে অর্জ্জুন! কর্ম্মই বা কি? আর অকর্ম্মই বা কাহাকে বলে? অর্থাৎ কর্ম্ম করিলেই বা কি হয়, আর না করিলেই বা কি হয়? এই সকল স্থির করিতে ভাবুক কবিগণও ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। অতএব যেরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে, ভববন্ধনরূপ দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাই কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ১৬॥

কিবা কর্ম্ম, কি বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম কেমন।
জ্ঞাতব্য এ তিন, গতি কর্ম্মের গহন ॥ ১৭ ॥
কর্ম্মেতে অকর্ম্ম হেরে, অকর্ম্মেতে কর্ম্ম।
লোকে সেই বোদ্ধা, যোগী, করে সর্ব্ব কর্ম্ম ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বারম্ভ যার কাম-সংকল্প-বর্জ্জিত।
জ্ঞান-দগ্ধ-কর্ম্মা, তারে বুধ কহে বুধ ॥ ১৯ ॥
ত্যাগি ফল, নিত্য-তৃপ্ত, নিরাশ্রয় নরে।
কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত কিন্তু কিছু নাহি করে ॥ ২০ ॥

হে অর্জ্জুন! কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপণ করিতে হইলে, কাহাকে শুভ বা বিধেয় কর্ম্ম, কাহাকে অশুভ বা অবিধেয় কর্ম্ম এবং কাহাকেই বা কর্ম্মশূন্যতা কহে, এই ত্রিবিধ বিষয়ই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ কর্ম্মের গতি অতীব দুর্জ্ঞেয় ॥ ১৭ ॥ হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন করেন অর্থাৎ বাহ্যে কর্ম্মযুক্ত থাকিয়াও অন্তরে নির্লিপ্ত ভাবে থাকেন এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন অর্থাৎ বাহ্যে কর্ম্ম না থাকিলেও অন্তরে ভগবানের ধ্যানরূপ কর্ম্মযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, ইহ লোকে তিনি সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও পরম বুদ্ধিমান ও যোগী বলিয়া উক্ত ॥ ১৮ ॥ হে অর্জ্জুন! যাহার কর্ম্ম সকল সর্ব্বপ্রকার ফলকামনা বর্জ্জিত সুতরাং নিষ্কাম হইলেই জ্ঞান আপনি প্রজ্বলিত হইয়া যাহার সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম করে, তাহাকেই পণ্ডিতগণ পণ্ডিত কহেন, নতুবা কেবল শব্দ উচ্চারণ বা শব্দ অধ্যয়ন করিলেই, পণ্ডিত হয় না, কারণ পক্ষীরাও অভ্যাসে বা শব্দের অধ্যয়নে, শিক্ষা লাভ করিয়া অবিকল মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে বা শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে ॥ ১৯ ॥ হে অর্জ্জুন! যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য তৃপ্ত এবং নিরাশ্রয় অর্থাৎ সকল আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না ॥ ২০ ॥

নিরাশী, সংযত-চিত, পরিগ্রহ-ত্যাগী।
দেহে মাত্র করি কর্ম্ম নহে পাপভাগী ॥ ২১ ॥
যদৃচ্ছা-লাভেতে-তুষ্ট, নির্ব্বের, নির্দ্বন্দ্ব।
সিদ্ধ্যসিদ্ধিসম কর্ম্ম করিয়া না বন্ধ ॥ ২২ ॥
গতসঙ্গ মুক্ত যেবা, জ্ঞানে স্থিত চিত।
যজ্ঞে কৃত কর্ম্ম তার সব লয় প্রাপ্ত ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মার্পণ, হবি, অগ্নি, ব্রহ্ম হোম করে।
ব্রহ্ম-কর্ম্ম-সমাধিস্থ চলে ব্রহ্মঘরে ॥ ২৪ ॥
দৈব-যজ্ঞ কোন যোগী আর বা সাধয়।
কেহ যজ্ঞে ব্রহ্মানলে যজ্ঞাহুতি দেয় ॥ ২৫ ॥

যিনি আশা পরিত্যাগ, চিত্ত সংযত এবং সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কেবল মাত্র দেহে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা কর্ম্ম করিয়া মনকে নির্লিপ্ত রাখিয়া সকল প্রকার কর্ম্মজ পাপ হইতে মুক্ত হন ॥ ২১ ॥ যিনি যদৃচ্ছা লাভে তুষ্ট, বৈরবিহীন, শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানী, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে বদ্ধ হন না ॥ ২২ ॥ যাঁহার চিত্ত নিষ্কাম সুতরাং বিশুদ্ধ জ্ঞানে অবস্থিত, তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন তৎসমুদয় লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩ ॥ হে অর্জ্জুন! এক্ষণে কি প্রকারে নিষ্কামীর কর্ম্ম সকল যজ্ঞে ভস্ম হয় তাহা বিস্তারপূর্ব্বক কহিতেছি শ্রবণ কর। কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞানী অবধূতগণ যাঁহাদের ব্রহ্মরূপ কর্ম্মেই সমাধি হইয়াছে, তাঁহারা ব্রহ্মই স্রুবাদিপাত্র, ব্রহ্মই হবনীয় ঘৃতাদি, ব্রহ্মই হোমকর্ত্তা ইত্যাদি রূপ সকল পদার্থেই ব্রহ্মদর্শনরূপ ব্রহ্মময় যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রহ্মেই যুক্ত হন ॥ ২৪ ॥ কোন কোন দৈবযোগী ইন্দ্র বরুণাদি দেবতাগণের আরাধনা পূর্ব্বক দৈবযজ্ঞের আচরণ করেন। কোন কোন বৈরাগ্যযোগী ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে অভ্যাসরূপ যজ্ঞ দ্বারা কর্ম্মরূপ যজ্ঞকে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক বৈরাগ্যযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

যমাগ্নিতে কেহ দেয় শ্রোত্রাদি আহুতি।
ইন্দ্রিয় অগ্নিতে কেহ বিষয় শব্দাদি ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রাণ-কর্ম্ম আহুতি প্রদানে।
জ্ঞানদীপ্ত আত্মযমযোগাগ্নিতে অন্যে ॥ ২৭ ॥
দ্রব্য-যজ্ঞ, তপ-যজ্ঞ, যোগ-যজ্ঞে রত।
স্বাধ্যায় ও জ্ঞান-যজ্ঞে যতি তীক্ষ্ণ-ব্রত ॥ ২৮ ॥
অপানে আহুতি প্রাণ, প্রাণেতে অপান।
প্রাণাপান-গতি রোধে প্রাণায়ামিগণ।
মিতাহারে কেহ প্রাণে 'হুতি দেয় প্রাণ ॥ ২৯ ॥
সর্ব্ব যজ্ঞবিদ্ যজ্ঞে পাপ করি ক্ষয়।
যজ্ঞশেষামৃত পানে সনাতনে পায় ॥ ৩০ ॥

কোন কোন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ সংযমরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয় সকলকে আহুতি প্রদান অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক যম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কোন কোন দ্বিতীয়াশ্রমী যোগী অর্থাৎ গৃহস্থগণ ইন্দ্রিয়-রূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়ার্থ সকল আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অর্থাৎ কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করত, মনকে নির্লিপ্ত রাখিয়া কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন ॥ ২৬ ॥ কোন কোন ধ্যানযোগী শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের ও শ্বসনাদি প্রাণবায়ুর কর্ম্ম সকল আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক অর্থাৎ ধ্যানে চিত্ত নিরোধ করত রাজযোগ অনুষ্ঠান করেন ॥ ৩৭ ॥ দৃঢ়ব্রত যতিগণ দ্রব্য সম্বন্ধীয়, তপস্যা সম্বন্ধীয়, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ সম্বন্ধীয় এবং বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জ্জন সম্বন্ধীয় যজ্ঞে নিযুক্ত থাকেন ॥ ২৮ ॥ কোন কোন প্রাণায়ামিগণ অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু এবং প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ু আহুতি প্রদান ও প্রাণ এবং অপান উভয় বায়ুর গতি রোধ করত, পুরণ, রেচন ও কুম্ভক করিয়া থকেন এবং কোন কোন নিয়মযোগী মিতাহারে প্রাণ বায়ুরূপ অগ্নিতে প্রাণ বায়ুকেই আহুতি প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ॥ ২৯ ॥ হে অর্জ্জুন! এইরূপে যজ্ঞকারিগণ যজ্ঞে পাপ ক্ষয় করত যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত পান করিয়া অবশেষে সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

অযজ্ঞের ইহ নাই পরকাল কিবা ॥ ৩১ ॥

বহুবিধ যজ্ঞ হেন বেদমুখে ব্যক্ত।
কর্ম্মজ সবায় জেনো, হেন জানি মুক্ত ॥ ৩২ ॥

দ্রব্যময় যজ্ঞ হতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।
ফলসহ সর্ব্ব যজ্ঞ জ্ঞানে পরিশিষ্ট ॥ ৩৩ ॥

প্রণামে, সেবায়, প্রশ্নে জ্ঞানে হও জ্ঞাত।
শিখাইবে জ্ঞান জ্ঞানী তত্ত্ব-দর্শী য়ত ॥ ৩৪ ॥

যায় জানি পুন পার্থ! মোহ নাহি রবে।
সর্ব্বভূত সম, মোতে আত্মায় হেরিবে ॥ ৩৫ ॥

সকল পাপীর চেয়ে পাপিশ্রেষ্ঠ হলে।
সন্তরিবে পাপজলে জ্ঞান-পোত বলে ॥ ৩৬ ॥

কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাসবিহীন হইয়া কোনরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান বা ধর্ম্মাচরণ না করে, তাহার ইহকালেই শুভ নাই, পরকাল ত দূরের কথা ॥ ৩১ ॥ হে অর্জ্জুন! এইরূপে বহুবিধ যজ্ঞ বেদে বিশদরূপে বর্ণিত আছে, কিন্তু সকলই কর্ম্মজাত—অর্থাৎ কর্ম্ম বিনা কোন যজ্ঞই আচরিত হয় না জানিও এবং এবম্প্রকার যজ্ঞ সকল যে ব্যক্তি সম্যগ্‌রূপে জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥ ৩২ ॥ হে অর্জ্জুন! দ্রব্যযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, কারণ সকল যজ্ঞই ফলের সহিত জ্ঞানে পারিসমাপ্ত—অর্থাৎ জ্ঞানে যুক্ত হওয়া বা নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হওয়া সকল যজ্ঞেরই উদ্দেশ্য ॥ ৩৩ ॥ অতএব তুমি প্রণাম পূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া জ্ঞান উপার্জ্জন কর এবং তোমাকে এইরূপে বিনত এবং শিক্ষার্থী দেখিলে তত্ত্বজ্ঞানিগণ তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে তোমাকে উপদেশ প্রদান করিবেন ॥ ৩৪ ॥ হে অর্জ্জুন। যে বিষয় জ্ঞাত হইলে, আর তোমাকে সংসারমায়ায় মুগ্ধ হইতে হইবে না এবং সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান ও আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে ॥ ৩৫ ॥ হে অর্জ্জুন! যদিও সকল পাপীর অপেক্ষা অধিক পাপী হও, তথাপি জ্ঞানতরির সাহায্যে পাপরূপ মহাসমুদ্রের পরপারে যাইতে পারিবে ॥ ৩৬ ॥

সাংখ্যে যোগে ভেদে অজ্ঞ, পণ্ডিত না বলে।
সম্যগেকাশ্রয়ে সিদ্ধ উভয়ের ফলে ॥ ৪ ॥
সাংখ্য পায় যেই স্থান, যোগী পায় তারে।
সাংখ্য, যোগ একরূপ যে হেরে সে হেরে ॥ ৫ ॥
অযোগ-সন্ন্যাস মাত্র দুঃখ ভোগ তরে।
যোগ-যুক্ত মুনি পায় ব্রহ্মেরে অচিরে ॥ ৬ ॥

হে অর্জ্জুন! মূর্খেরাই সাংখ্যযোগ অর্থাৎ বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ ধারণা পূর্ব্বক আশাশূন্য হইয়া কর্ম্মের সন্ন্যাস বা ত্যাগ ও কর্ম্মযোগ অর্থাৎ স্পৃহা-শূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান—এই উভয়কে প্রভেদ জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা কহেন না; যেহেতু সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইয়া একটীকে অবলম্বন করিলেই উভয়ের ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ কারণ সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্ন্যাসিগণ কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মের সন্ন্যাস করত যে মোক্ষরূপ অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কর্ম্মযোগীরাও স্পৃহাশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত সেই মোক্ষধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; সুতরাং স্পৃহাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা, আর কর্ম্ম না করা উভয়ই সমান। অতএব যিনি সাংখ্য-যোগ ও কর্ম্মযোগ দুই একরূপ দর্শন করেন তিনিই যথার্থদর্শী, কারণ বস্তুর পরিণামই বস্তু, ফলের জন্যই বৃক্ষ, আহারের জন্যই আহরণ, সিদ্ধির জন্যই সাধন, পশ্চাৎ সুখের জন্যই সম্মুখ-দুঃখের আহ্বান, মরণের বা জীবন্মুক্তির জন্যই জীবন ইত্যাদিরূপ পরিণামই বস্তুর প্রকৃত পরিচয়। অতএব সন্ন্যাস ও কর্ম্ম উভয়েরই পরিণাম মোক্ষ—সুতরাং দুইই এক ॥ ৫ ॥ হে অর্জ্জুন! যোগহীন সন্ন্যাস অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকৃতিতত্ত্ব অবগত না হইয়া এবং মনকে একনিষ্ঠ ও স্পৃহাশূন্য না করিয়া কেবল সন্ন্যাসী হইতে সাধ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, কেবল সুস্থ শরীরকে বৃথা কষ্ট দিয়া ব্যস্ত করা হয়—অর্থাৎ অসংযমীর পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ করা অপেক্ষা, সাধারণের ন্যায় আশাযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করাও শ্রেয়। কিন্তু যে মুনিগণ যোগযুক্ত অর্থাৎ স্পৃহাশূন্য হইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত, তাঁহারা শীঘ্রই মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

যোগ-যুক্ত, শুদ্ধ-চিত, দেহেন্দ্রিয়-জিত।
সর্ব্বাত্মভূতাত্মা কর্ম্ম করি নহে লিপ্ত॥ ৭ ॥

কিছুই না করি, হেরি, ভাবে যুক্ত জ্ঞানী।
শুনি, স্পর্শি, ভোজি, নিদ্রি, চলি, শ্বাসি, ঘ্রাণী॥ ৮ ॥

উন্মেষি, নিমেষি, ভাষি, গ্রহণি তেয়াগি।
ইন্দ্রিয় বিষয়ে রহে, স্থির করে যোগী॥ ৯ ॥

ব্রহ্মে অর্পি করে কর্ম্ম, সঙ্গ পরিহরি।
পাপে না সে লিপ্ত, যথা পদ্মপত্রবারি॥ ১০ ॥

কায়-মন-চিত্তে করে কেবল ইন্দ্রিয়ে।
আত্মশুদ্ধি তরে যোগী সঙ্গ তেয়াগিয়ে॥ ১১ ॥

হে অর্জ্জুন! যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানে অবস্থিত ও বশীভূত, যিনি মদেক-চিত্ত হইয়া যোগ যুক্ত, যাঁহার আত্মা নির্ম্মলতাহেতু সর্ব্বভূতের আত্মাতেই রহিয়াছে অর্থাৎ যিনি সকলকেই আত্মবৎ দর্শন করিতেছেন, তিনি কর্ম্ম করিলেও কদাচ কর্ম্মে লিপ্ত হন না। কারণ স্পৃহা উপাদান আটাস্বরূপ কর্ম্মকে লিপ্ত করিয়া দেয়। আটা না থাকিলে বালির অট্টালিকা যেরূপ বালিতেই ভগ্ন হয়, সেইরূপ আসক্তি না থাকায় নিষ্কামীর কর্ম্মসকল কর্ম্মেই লয় প্রাপ্ত হয়॥ ৭ ॥
হে অর্জ্জুন! যিনি যোগযুক্ত ও জ্ঞানী, তিনি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ভোজন, শয়ন, চলন, শ্বসন, আঘ্রাণ, উন্মীলন, নিমীলন, গ্রহণ, আলাপ, ত্যাগ ইত্যাদি কর্ম্ম সকল করিয়াও—আমি কিছুই করিতেছি না—এইরূপ অবিচলিতচিত্তে ধারণা করিয়া, ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় সকলেই থাকে, এই স্থির করত নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করেন॥ ৮—৯ ॥
হে অর্জ্জুন! যিনি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্রে বারি যেরূপ নির্লিপ্তভাবে সংলগ্ন থাকে, তিনি সেইরূপ পাপের উপরে থাকিয়াও পাপে লিপ্ত হন না॥ ১০ ॥
হে অর্জ্জুন! যোগিগণ চিত্তশুদ্ধির জন্য, শারিরীক কর্ম্ম শরীর দ্বারা, মানসিক কর্ম্ম মনের দ্বারা এবং বুদ্ধির কর্ম্ম বুদ্ধির দ্বারা, স্পৃহাশূন্য হইয়া কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া থাকেন॥ ১১ ॥

কর্ম্মফল ত্যাগি যুক্ত পরা-শান্তি লভে।
অযুক্ত কামনা বশে বদ্ধ ফললোভে ॥ ১২ ॥

সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগি মনে সুখে বশী রয়।
নবদ্বারপুরে দেহী না করে করায় ॥ ১৩ ॥

প্রভু নাহি সৃজে কর্ম্ম, লোকের কর্ত্তৃত্ব।
নাহি কর্ম্ম-ফল-যোগ, স্বভাবে প্রবর্ত্ত ॥ ১৪ ॥

না লন কাহারো বিভু পাপপুণ্যচয়।
অজ্ঞানে আবৃত জ্ঞান জীব মুগ্ধ তায় ॥ ১৫ ॥

আত্মজ্ঞানে অজ্ঞানেরে যেজন বিনাশে।
সে পরম জ্ঞান তার আদিত্য প্রকাশে ॥ ১৬ ॥

হে অর্জ্জুন। মদেকচিত্ত যোগিগণ কর্ম্মফল ত্যাগ পূর্ব্বক পরা শান্তি প্রাপ্ত হন, কিন্তু কামনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্ম্মফলে আসক্তি থাকায় কর্ম্মে নিবদ্ধ হইয়া শান্তির পরিবর্ত্তে ঘোর দুঃখে জর্জ্জরিত হইতে থাকে ॥ ১২ ॥ হে অর্জ্জুন। বশী দেহী অর্থাৎ সংযমী পুরুষ এইরূপ মনে মনে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বয়ং কর্ম্মে রত না হইয়া এবং কাহাকেও কর্ম্মে প্রবৃত্ত না করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে সুখে অবস্থান করেন—অর্থাৎ যিনি কামনা শূন্য হইয়াছেন তিনি এই জীবনেই পরমানন্দ ভোগ করত জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১৩ ॥ হে অর্জ্জুন! প্রভু অর্থাৎ পরব্রহ্ম কাহারও কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্ম বা কর্ম্মফলযোগ কিছুই সৃজন করেন না। তৎসমুদয় স্বভাব হইতে উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে—আত্মা স্বয়ং নিস্পৃহ ॥ ১৪ ॥ সুতরাং কোনরূপে কর্ম্মজাত পাপ বা পুণ্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জ্ঞানরূপী আত্মা অজ্ঞানে আবৃত বলিয়া জীবগণ মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞান বশতই কর্ম্ম করিয়া থাকে—অর্থাৎ যেরূপ আলোক থাকিলেই অন্ধকার আছে, সৎ থাকিলেই অসৎ থাকে, সেইরূপ প্রধানের অজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। অতএব জ্ঞানোত্থিত শক্তি বা অজ্ঞান বা মায়া বা প্রকৃতি জ্ঞানকেই আবৃত করিয়া এই নিখিল জগৎ উৎপন্ন করিয়াছে—অতএব মায়ারই সৃষ্টি—মায়ারই এই ঘোর সংসার রূপ কর্ম্ম চক্র ॥ ১৫ ॥ অতএব হে অর্জ্জুন! যিনি জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক অজ্ঞানকে দূরীভূত করিয়াছেন, তাঁহার সেই জ্ঞান নির্ম্মল সূর্য্য কিরণের ন্যায় প্রকাশ পায় ॥ ১৬ ॥

তন্নিষ্ঠ, তৎপরায়ণ, তদাত্ম, তদ্বুদ্ধ।
নির্ধূত করিয়া পাপ জ্ঞানে মোক্ষপ্রাপ্ত ॥ ১৭ ॥

ব্রাহ্মণ বিনয়-বিদ্যা-সম্পন্ন, গো, করী।
কুক্কুর, চণ্ডাল সম পণ্ডিত নেহারি ॥ ১৮ ॥

ইহে সর্গ জিনে, যার সাম্যে স্থিত মতি।
নিরদোষ সম ব্রহ্ম, ব্রহ্মে তার স্থিতি ॥ ১৯ ॥

নাহি হাসে প্রিয় পাশে, অপ্রিয়ে না দুখে।
স্থিরধী অমূঢ ব্রাহ্ম ব্রহ্মেতেই থাকে ॥ ২০ ॥

বাহ্যস্পর্শে অনাসক্ত সুখী আত্মসুখে।
ব্রহ্মযোগযুক্ত সেই লভে চিরসুখে ॥ ২১ ॥

স্পর্শজাত ভোগচয় দুঃখকর যত।
আদি-অন্ত-বান্, তাহে পণ্ডিত না রত ॥ ২২ ॥

হে অর্জ্জুন! যিনি তদ্বুদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মেই যার চিত্ত সমর্পিত, তদাত্ম অর্থাৎ ব্রহ্মেই যার স্বার্থ ন্যস্ত, তন্নিষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্মেই যাঁর নিষ্ঠা এবং যিনি ব্রহ্মপরায়ণ, তিনি জ্ঞানদ্বারা পাপ নির্ধূত করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন॥ ১৭। হে অর্জ্জুন! পণ্ডিতগণ, আচার বিনয় ও বিদ্যা সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালকে সমান রূপ দেখিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ যাঁহার মন এইরূপ সাম্য বা সমতায় অবস্থিত, তিনি ইহকালেই সংসার জয় করিয়া থাকেন এবং পরব্রহ্ম নির্ব্বিকার ও সমভাবাপন্ন বলিয়া, তিনি সেই ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হন ॥ ১৯ ॥ হে অর্জ্জুন! যিনি প্রিয় বস্তু লাভে আহ্লাদিত বা অপ্রিয় বস্তু লাভে দুঃখিত হন না, সেই ধৈর্য্যশীল মায়ামুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মেই অবস্থান করেন ॥ ২০ ॥ যিনি বিষয় ভোগে অনাসক্ত, আপনা আপনিই সন্তুষ্ট, তিনিই ব্রহ্মযোগে যুক্ত এবং তিনিই চিরসুখ বা পরাশান্তি লাভ করেন ॥ ২১ ॥ হে অর্জ্জুন! পরস্পর সংযোগে যে সমুদয় বিষয়ের উপভোগ হয় তৎসমুদয়ই দুঃখের কারণ, যেহেতু সে সমুদয়ের প্রতিনিয়তই উৎপত্তি ও অভাব হইতেছে, সুতরাং পণ্ডিতগণ সেই সকল ক্ষণস্থায়ী বিষয়ে আসক্ত হন না ॥ ২২ ॥

মরণের পূর্ব্বে যেবা সহিতে হে! শক্ত।
কামক্রোধোদ্ভব বেগ, সে সুখী, সে যুক্ত ॥ ২৩ ॥
অন্তরে যাহার সুখ, আরাম ও জ্যোতি।
ব্রহ্মভূত সেই যোগী, নির্ব্বাণেতে গতি ॥ ২৪ ॥
নির্ব্বাণ লভয়ে ঋষি পাপে করি হত।
অসংশয়ী যত-চিত সর্ব্ব-হিতে রত ॥ ২৫ ॥
কাম-ক্রোধ-হীন যত যতি যতচেতা।
উভয়ত মোক্ষ প্রাপ্ত আত্ম-তত্ত্ব-বেত্তা ॥ ২৬ ॥
ভ্রূমধ্যে নয়ন, বাহ্য-স্পর্শ দূর কবি।
সম করি প্রাণাপানে নাসা-মধ্য-চারী ॥ ২৭ ॥
যত-মন-বুদ্ধীন্দ্রিয়, মুনি মোক্ষ-রত।
ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ-হীন সেই সদা মুক্ত ॥ ২৮ ॥
যজ্ঞ-তপ-ভোক্তা, সর্ব্বলোক-মহেশ্বর।
সর্ব্বসুহৃৎ জানি মোরে শান্তি পায় নর ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সন্ন্যাস যোগ নামে
পঞ্চম অধ্যায়।

হে অর্জ্জুন! যিনি এই জীবনেই কাম ও ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ, তিনিই সুখী এবং যোগাসক্ত ॥ ২৩ ॥ যাঁহার অন্তরেই সুখ, অন্তরেই আরাম এবং অন্তরেই দৃষ্টি, তিনিই ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থিত এবং সেই যোগীই ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥ এইরূপে ঋষিগণ সংশয়বিহীন সংযতচিত্ত, এবং সর্ব্বহিতে রত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥ হে অর্জ্জুন! সংযতচিত্ত যতিগণ কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া কি জীবনে, কি মরণে উভয়তই মুক্ত হন ॥ ২৬ ॥ মোক্ষপরায়ণ মুনিগণ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত; বিষয়সম্বন্ধ, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধকে দূরীভূত; ভ্রূমধ্যে নয়নদ্বয় সন্নিবেশিত; এবং নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বয়কে কুম্ভকযোগে একীভূত করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৭—২৮ ॥ হে অর্জ্জুন! যোগিজন এইরূপে আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের সুহৃদ জানিয়া শান্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯ ॥